সংস্কৃত কলেজ নিয়ে সরকারের দ্বিচারিতা
— পৃঃ ১৪

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

সংস্কৃতি জাগরণে সংস্কৃত আজ আন্দোলনের পথে
— পৃঃ ১৬

৬৭ বর্ষ, ৫২ সংখ্যা।। ২৪ আগস্ট ২০১৫।। ৬ ভাদ্র - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

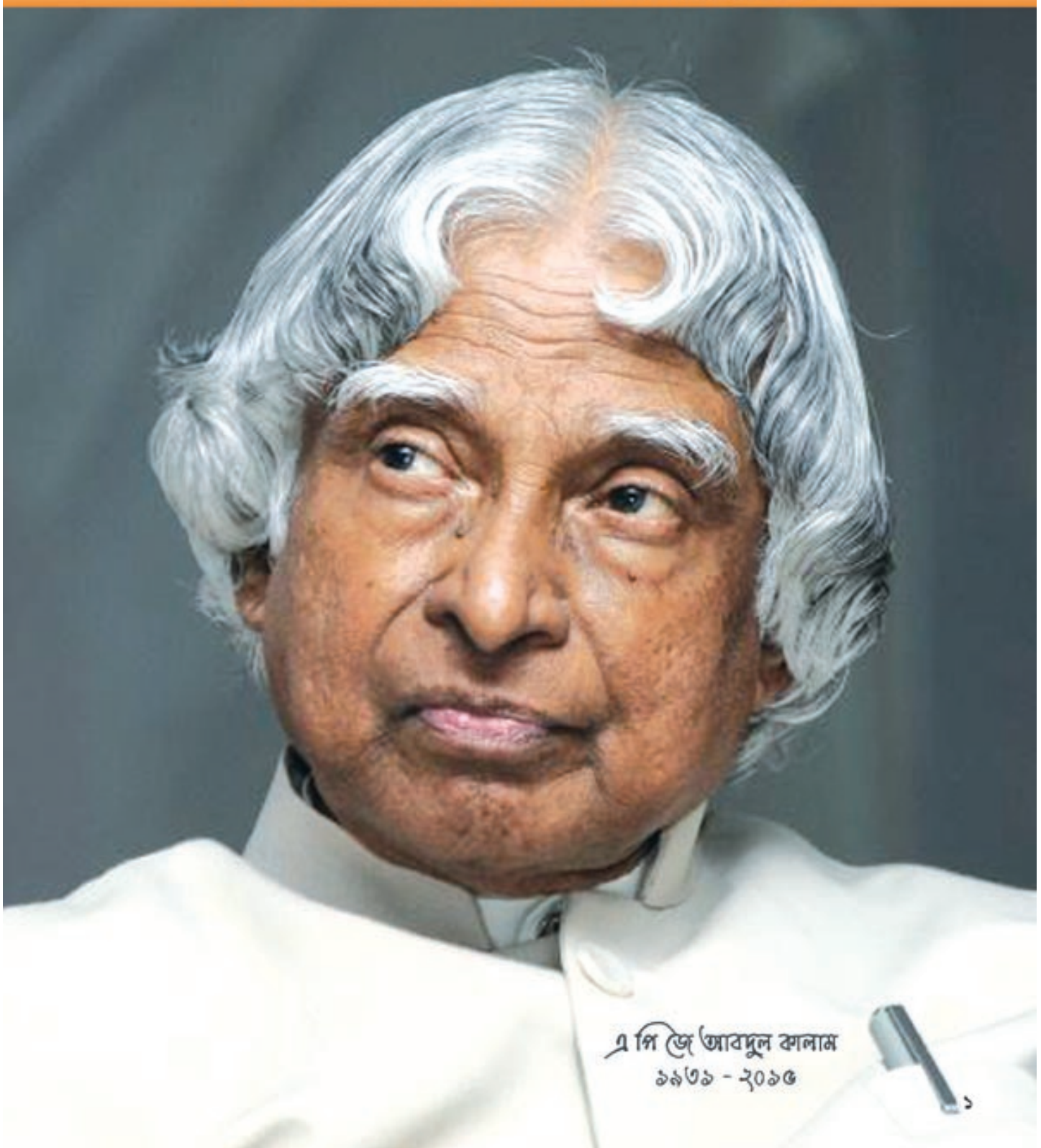

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৫২ সংখ্যা, ৬ ভাদ্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২৪ আগষ্ট - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

পক্ষপাতদুষ্ট সাংবাদিকরা জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : গান্ধী পরিবারই দেশের রাজা হোক ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ত্রাণকাজে সরকারি ব্যর্থতা ▯ দেবব্রত ঘোষ ▯ ১২

সংস্কৃত কলেজ নিয়ে সরকারের দ্বিচারিতা ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ১৪

সংস্কৃতি জাগরণে সংস্কৃত আজ আন্দোলনের পথে ▯ প্রণব নন্দ ▯ ১৬

আত্মরক্ষা কতটা জরুরি ▯ শ্রীমতী লক্ষ্মী দাস ▯ ২০

রাখি— একাত্মতা জাগরণের প্রতীক ▯ রাজদীপ মিশ্র ▯ ২১

রাধা দামোদরের 'পঞ্চরত্ন' ও সতেরো চূড়া রাসমঞ্চ ▯ ড. প্রণব রায় ▯ ২৩

গঙ্গা ভারতের আর্থিক রাজধানী ▯ তরুণ বিজয় ▯ ২৭

আগুনের ডানা নিয়ে এক বিজ্ঞানী ▯ শুভদীপ পাল ▯ ২৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬- ৩৮▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বেটি বাঁচাও

বিপন্ন আজ হিন্দু নারী। বিশেষত অল্পবয়সী মেয়েরা। একশ্রেণীর বিধর্মী মানুষের প্রতারণা ও লালসার শিকার হচ্ছে তারা। মেয়েরা যদি এভাবে প্রতারণা ও অত্যাচারের শিকার হতে থাকে তবে তা সমগ্র হিন্দু সমাজেরই কলঙ্ক। এই কলঙ্ক থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য সমগ্র সমাজ, বিশেষত যুবকদের এগিয়ে আসা দরকার। এবারে এই বিশেষ বিষয়ে লিখেছেন অনসূয়া চন্দ্র, রিনি রায় প্রমুখ।

সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা।। সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

টিম ইন্ডিয়া

স্বয়ং রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণে সাংসদদের কাজকর্মে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সদস্যরা সংসদের বাদল অধিবেশনটিকে রণক্ষেত্রে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই রাষ্ট্রপতির এই ঊষ্মা এবং তাহা সঙ্গতও বটে। এক তিক্ততার সঙ্গে বাদল অধিবেশন শেষ হইবার পরে পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৬৯ তম স্বাধীনতা দিবসে দিল্লীর লালকেল্লার প্রাকার হইতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়াছেন। লক্ষণীয় বিষয় হইল, তিনি এই সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠিয়া 'সওয়া সও করোড়' (১২৫ কোটি) দেশবাসীর 'টিম ইন্ডিয়া'-র সাফল্যকেই বড়ো করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। দেশের উন্নয়ন যজ্ঞে প্রতিটি নাগরিকেরই অংশগ্রহণ রহিয়াছে—এই ভাবনায় দেশবাসীকে উদ্দীপিত করিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'গত এক বছরে দেশের উন্নয়নের জন্য 'টিম ইন্ডিয়া' নিজেদের কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছে। একতাই ভারতীয়দের শক্তি। যদি ভারতীয়দের একতা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে মানুষের স্বপ্নও ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই শক্তিকে নষ্ট করিতে দেওয়া যাইবে না। জাতিভেদের বিষ এবং সাম্প্রদায়িকতার কোনো জায়গা নেই এই দেশে।'

দুর্নীতিকে ঘুণপোকার সহিত তুলনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, লোকসভা ভোটের আগে দেশবাসীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি হইতে তিনি এক ইঞ্চিও সরিয়া আসেন নাই। গত ১৫ মাসে তাঁহার সরকারের বিরুদ্ধে এক নয়া পয়সার দুর্নীতির অভিযোগ উঠে নাই। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা যে ফাঁকা আওয়াজ নয়, সাম্প্রতিক মধ্যপ্রদেশে অনুষ্ঠিত পুর-ভোটের ফলাফলই তাহার প্রমাণ। ব্যপম কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করিয়া বিরোধীরা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের পদত্যাগের দাবিতেও সংসদের বাদল অধিবেশনে অচলাবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে কালোটাকা উদ্ধারে তাঁহার সরকারের ভূমিকাও তিনি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এবং সরকারের উপর নানা দিক হইতে চাপ আসিতেছে—ইহা জানাইয়া দিয়া তিনি বলিয়াছেন, কালোটাকা উদ্ধারে তাঁহার সরকার সেই চাপের কাছে মাথা নত করিবে না। ইতিমধ্যেই ৬৫ হাজার কোটি টাকা উদ্ধার হইয়াছে। বাকি টাকাও যাহাতে উদ্ধার হয় সেইজন্য জি গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি কালো টাকার ব্যাপারে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তথ্য বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে উঠিয়া আসিয়াছে 'এক ব্যক্তি এক পেনশন' ইস্যুর কথাও। গত কয়েকদিন ধরিয়া এই ইস্যুতে প্রতিরক্ষা কর্মীদের একাংশ দিল্লীতে ধরনায় বসিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী এই নীতি চালু করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। কিন্তু এই নীতি কার্যকর করিতে যাইলে প্যান্ডোরার বাক্স যে খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা ইহা স্মরণ রাখা দরকার।

এই ভাষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ দিক হইল প্রধানমন্ত্রী নিজের সামনেই একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়িয়া দিয়াছেন। গত ৬৯ বছরে দেশের যে ১৮,৫০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছায় নাই, ১০০০ দিনের মধ্যে তাঁহার সরকার তাহা পৌঁছাইয়া দিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যদি এই লক্ষ্যের আশি শতাংশও পূর্ণ হয়, তাহা হইলে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হইবে। মোদীর ভারত বা 'টিম ইন্ডিয়া' যাহাই করুক না কেন সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ তাঁহাকে ঘৃণা ও বিদ্রূপের চক্ষে দেখিবে—ইহা মনে রাখিয়াও বলা দরকার—নিজের স্বপ্নকে পূরণ করিবার জন্য তাঁহার কোনো দ্বিধার প্রয়োজন নাই। তিনি এগিয়ে চলুন। 'টিম ইন্ডিয়া' তাঁহার সঙ্গেই আছে।

সুভাষিতম্

শোকো নাশয়তে ধৈর্যং শোকো নাশয়তে স্মৃতম্।
শোকো নাশয়তে সর্বং নাস্তি শোকসমো রিপু।।

শোক ধৈর্য নাশ করে, শোক স্মৃতিশক্তি নাশ করে, শোক সবকিছু নাশ করে। তাই শোকের সমান শত্রু নেই।

অসমে প্রকৃত বাসিন্দাদের চিহ্নিত করতে এন আর সি 'আপডেট'-এর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অসমের প্রকৃত বাসিন্দাদের চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন্স (এন আর সি) ১৯৫১-এর সাম্প্রতিকতম সংস্কারের (আপডেট) উদ্যোগ নিল অসম সরকার। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলির অনুগ্রহপ্রাপ্ত অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করা সম্ভব হবে এবং এই সংস্কারের পথেই বাঙালি হিন্দুদের নাগরিকত্ব সমাধানের একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আর এস এসের সহ-সরকার্যবাহ কৃষ্ণগোপাল শর্মার আশা চলতি মাসের মধ্যেই অসমের বাঙালি হিন্দুদের নাগরিকত্ব সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হবে। তবে এন আর সি ১৯৫১ এবং ১৯৫২-এর নির্বাচনী তালিকাতে ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের মধ্যরাত পর্যন্ত যারা (এসেছে তাদের) নাম নথিভুক্ত করেছে কেবলমাত্র তারা এবং তাদের উত্তরাধিকারীরাই সংশোধিত এন আর সি তালিকায় ঠাঁই পাবে। এছাড়াও অসমে বসবাসকারী অন্যান্য রাজ্যের বাসিন্দারাও নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে উপরোক্ত তালিকায় নাম নথিভুক্তের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। যে সমস্ত বাংলাদেশি ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পরে অসমে এসেছে তারা এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে না। সংবিধানের নাগরিকত্ব আইন ২০০৩ এর ৪নং ধারায় (রেজিস্ট্রেশন অফ সিটিজেনস্ অ্যান্ড ইস্যু অফ্ ন্যাশনাল আইডেনটিটি কার্ডস) এই তালিকায় সংশোধিত হচ্ছে।

অসমেই জন্মগ্রহণ করেছে বা পিতৃমাতৃ সংযোগের প্রমাণ স্বরূপ এন আর সি ১৯৫১ অথবা নির্বাচনী তালিকায় নাম নথিভুক্তের প্রমাণ- সহ আরও ১২টি পরিচয়পত্রের মধ্যে অন্তত যে কোনো একটি প্রমাণ স্বরূপ আবেদন পত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। এমনকী বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা সার্কেল অফিসারের থেকে অভিজ্ঞানপত্র অথবা তার আদি বাসস্থানের রেশন কার্ডের কপি জমা দিতে হবে।

এন আর সি সংশোধনের জন্য সরকার যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছে সেগুলি সঠিক হলেও তার জন্য সমস্যায় পড়েছে অসমেরই বিভিন্ন উপজাতির মানুষজন। যে সকল অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষেরা ফর্ম পূরণ করা বা নির্ধারিত নথিপত্র জোগাড়ে অপারগ তারা কষ্টকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং সুযোগ পেয়ে দালালরাও অর্থের লোভে এদের শোষণ করছে। এরা ভূমিপুত্র হলেও এদের কাছে কোনো সরকারি তথ্যপ্রমাণাদি নেই। সরকারি নথিপত্রের অভাবের জন্য বহু সংস্থা জন্মসূত্রে সরাসরিভাবে এন আর সি-তে নাম নথিভুক্তকরণের জন্য দাবি জানাচ্ছে। ভারতীয় লোকমঞ্চের সভাপতি সুধেন্দুমোহন তালুকদারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল কোনো ভিত্তিবর্ষ ছাড়াই বাঙালি হিন্দুদের এন আর সি-তে নথিভুক্তকরণের জন্য কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ-র কাছে দাবি জানাবে বলে লোকমঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

সিটিজেনশিপ রুলস্ ২০০৩ ছাড়াও সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট ১৯৫৫- এর ৬ (এ) ধারাতেও এন আর সি সংশোধনী প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে। তবে যে সকল অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ২৫ মার্চ, ১৯৭১ এর আগে ফরেনারস্ রেজিস্ট্রেশন রিজিওনাল অফিসারের কাছে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছিলেন তারা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে সংশোধিত তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হলেও কতজন এই নিয়ম অনুসরণ করে তা বিতর্কিত বিষয়। কারণ এই সকল বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা প্রয়োজন মতো অবাধে যাতায়াত করে। কিছু রাজনৈতিক দলগুলি ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির লোভে ২৫ মার্চ, ১৯৭১-এ যে নির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে তাতে আপত্তি জানিয়েছে। অন্যদিকে যারা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব না ছেড়েই ভারতের নাগরিকত্ব নিয়েছে তাদের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে। তাই রাজনৈতিক দলগুলির ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির পরিবর্তে দেশের সুরক্ষার জন্য তাদের এই প্রকার দাবির পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই সংশোধনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে অসমে প্রবেশের জন্য যাদের কোনো বৈধ প্রমাণাদি নেই, তাদের কোনোমতেই সংশোধিত এন আর সি তালিকায় নাম নথিভুক্ত করা হবে না। সংবিধান অনুসারে ১৯৪৮, ১৯ জুলাই-এর পর পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে আগত অভিবাসীদের বিদেশি বলে গণ্য করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশানুসারে কারোও নাগরিকত্ব নিয়ে কোনো সন্দেহ দেখা দিলে ফরেনারস্ অ্যাক্ট ১৯৪৬-এর আওতায় তার মীমাংসা হবে। সুপ্রিম কোর্টের কড়া নজরদারির মধ্যেই এন আর সি সংশোধনী প্রক্রিয়ার কাজ চলছে এবং ২০১৬-এর জানুয়ারি মাসের মধ্যেই সংশোধিত তালিকা প্রকাশের নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অসমের আসন্ন নির্বাচন ত্রুটিপূর্ণ অসংশোধিত ভোটার তালিকার মাধ্যমেই হবে। যার ফলে রাজনৈতিক দলগুলি লাভবান হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে।

নেপালকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায় মুসলমানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শুনতে অবাক লাগলেও ঘটনা হলো নেপালের মুসলমানরা সেই দেশের পুরনো হিন্দু পরিচিতি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচার অভিযান চালাচ্ছে। সেকুলার সংবিধান থেকে হিন্দু রাজ্যের আওতায় থাকাকে তারা বেশি নিরাপদ বলে মনে করছে।

রাপ্তি মুসলিম সোসাইটি-র চেয়ারম্যান আমজাদ আলি বলেছেন, হিন্দুরাষ্ট্রে ইসলামের নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকবে। সিপিএম-ইউএমএল মিত্র সদস্য আনারকলি মিয়া বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো খৃষ্টান মিশনারীরা নিজেদের দলে টানতে লোকেদের প্রভাবিত করছে। তাঁর মতে— 'নেপালের কিছুতেই ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া উচিত নয়। এটা শুধু ভবিষ্যতে আরও অনেক সমস্যা সৃষ্টি করবে।'

নেপালকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষণার চেষ্টা আসলে এখানকার দীর্ঘদিনের হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিকেই ধ্বংস করার চক্রান্ত। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা নিয়ে নেপালবাসীকে বাঁচতে হলে নেপালের পুরনো হিন্দুরাষ্ট্র পরিচিতিকে ফিরিয়ে আনা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। সম্প্রতি এই কথা বলেছেন বাবু থান পাঠান। তিনি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম মঞ্চ নেপালগঞ্জ-এর চেয়ারপার্সন। তাঁর বক্তব্য, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে পরিচিত হতে চাই না। সকলের নিরপত্তা সুরক্ষিত করার জন্য হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবেই নেপালকে দেখতে চাই। তিনি দাবি করেন, নেপালের ৮০ শতাংশ মুসলমানই হিন্দুরাষ্ট্র পরিচিতি ফিরিয়ে আনতে চায়।

ভারতের যুদ্ধ-ইতিহাস বিষয়ক বই প্রকাশে উদ্যোগী কেন্দ্র সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের বিরুদ্ধে সংঘটিত নিকট অতীতের যুদ্ধগুলির ইতিহাস সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ বই প্রকাশের উদ্যোগ নিল কেন্দ্র সরকার। সূত্র অনুযায়ী, এই যুদ্ধ-ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে এযাবৎ অতি স্বল্প আলোচিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অসংখ্য ভারতীয় সেনা বিদেশে মিত্রশক্তি সৈন্য হিসেবে যে পরাক্রম দেখিয়েছিল তার বর্ণনা যেমন থাকবে তেমনই ১৯৯৯-এর স্বাধীন ভারতে কার্গিল থেকে পাকিস্তানি ফৌজকে নাস্তানাবুদ করে তাড়ানোর ইতিহাসও অন্তর্ভুক্ত হবে। মোট পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশের নির্ঘণ্টও ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২০২০-২২ এর মধ্যে এই যুদ্ধ

কার্গিলে যুদ্ধরত ভারতীয় সেনাবাহিনী। (ফাইল চিত্র)

ইতিহাস সমগ্র রচনার কাজ সম্পন্ন হবে বলে খবর। অবশ্য যুদ্ধ-ইতিহাস ছাড়াও টেলিফিল্ম, কমিক বই ও বিবিধ প্রকাশন এই উদ্যোগের অধীনে জনতার কাছে হাজির হতে চলেছে।

প্রতিরক্ষা দপ্তরের এক প্রবীণ আধিকারিকের বক্তব্য অনুযায়ী, স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনোত্তর ভারতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহিঃশত্রু আক্রমণের মোকাবিলা, অভ্যন্তরীণ আপতকালীন অবস্থা বা অভ্যুত্থানজনিত পরিস্থিতি থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্য হিসেবে সদর্থক ভূমিকা পালন সবই বিবৃত হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের কাছে দেশের সেনাবাহিনীর গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা ও আত্মত্যাগকে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ বলে জানা যায়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী— (১) ১.৯.২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হবে ১৯৬৩ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের ইতিহাস যেখানে ৩২৬৪ জন ভারতীয় সেনানীর মৃত্যু হয়েছিল।

(২) ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। যে লড়াইয়ের ময়দানে প্রাণ হারিয়েছিলেন ৩৮৪৩ জন ভারতীয় সেনা। আত্মসমর্পণের সময় ঢাকায় বন্দী হয়েছিল রেকর্ড সংখ্যক অর্থাৎ ৯৩ হাজার পাক সেনা। এই গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাব্য দিনক্ষণ ডিসেম্বর ২০১৬। (৩) ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধের বিংশতি বর্ষ উদযাপনের সময় অর্থাৎ জুলাই ২০১৯ সালে প্রকাশিত হবে কার্গিল যুদ্ধ বিষয়ক বই। যেখানে থাকবে ৫২২ জন ভারতীয় সেনার জীবনের বিনিময়ে পাকিস্তানি আক্রমণকারীদের নির্মূল হওয়ার ইতিহাস। (৪) এরপর আসবে প্রাক স্বাধীনতা যুগের ঔপনিবেশিক শাসকের হয়ে ১৯১৪-১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ ব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। শুধু পরিখা যুদ্ধে (Trench Warfare) নিহত হয়েছিলেন ১ লক্ষেরও বেশি বৃটিশ অধীনস্থ ভারতীয় সেনা। এই বইটির সম্ভবত প্রকাশিত হবে ২০১৯-২০। (৫) সবশেষে, ২০২০-২২ এর মধ্যে প্রকাশিত হবে ১৯৬২-র ভারত চীন যুদ্ধের আনুপূর্বিক ইতিহাস ও তদানীন্তন নেহরু সরকারের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতির ফলে ভারতীয় বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়। এছাড়া সূত্র অনুযায়ী ২০১৭ সালে রাজীব গান্ধীর প্রচেষ্টায় ১৯৮৭ সালে ভারতীয় শান্তিরক্ষাবাহিনীর পক্ষে 'operation pawan'-এর চরম ব্যর্থতার ইতিহাস নিয়ে একটি গ্রন্থ। ওয়াকিবহালমহল এমন একটি অভাবনীয় উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

১৯৯১ থেকে ২৬ জনের ফাঁসির মধ্যে মুসলমান মাত্র ৪ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৯৯১ সাল থেকে ভারতে যে ২৬ জনের ফাঁসি হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ৪ জন মুসলমান। অথচ দেশের এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমে ইয়াকুব মেমনের ফাঁসিকে কেন্দ্র করে প্রচার করা হচ্ছে বেছে বেছে মুসলমানদের ফাঁসি দেওয়াই এর লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তর এই ধরনের সংবাদ সম্প্রসারণের জন্য তিনটি চ্যানেলের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে।

মন্ত্রকের এক অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে বলা হয়েছে— আজতক, এবিপি নিউজ, এনডিটিভি ইন্ডিয়া ও এনডিটিভি ২৪×৭ এই চারটি বৈদ্যুতিন চ্যানেল সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের প্রচার চালাচ্ছে। রিপোর্টে এটাকে 'জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গভীর উদ্বেগের এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজবপন' হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। মন্ত্রক চ্যানেলগুলির কাছে এইসব প্রচারের কারণের ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। চ্যানেলগুলি দেশের রাষ্ট্রপতি ও বিচার বিভাগের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ এবং হিংসার উত্তেজনা ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আশঙ্কাজনক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

দুটি হিন্দি চ্যানেল কোনোরকম সম্পাদনা ছাড়াই মুম্বই বিস্ফোরণের গ্যাংস্টার ছোটা সাকিলের সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে যা সাম্প্রদায়িক হিংসায় ইন্ধন যোগাবে। ছোটা শাকিল আজতক-এ দেওয়া সেই সাক্ষাৎকারে বলেছে— সারাবিশ্ব দেখেছে ইয়াকুবের সঙ্গে তোমরা কেমন ব্যবহার করেছ। ...আমরা তোমাদের বিচার বিভাগকে বিশ্বাস করি না। প্রতিহিংসার ভিত্তিতেই এই বিচার হয়েছে।

আর এবিপি নিউজকে বলেছে— একজন নিরীহ ব্যক্তিকে তোমরা কীভাবে ফাঁসি দিয়েছে সারা বিশ্ব তা দেখেছে। বাবরিধাঁচা ধ্বংসের পর লোকেরা তার বদলা নিয়েছে, অনেক ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যেকটি ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে। তোমাদের ওখানে বহু মানুষই আমাদের পাশে আছে (যারা বদলা নেবে)।

এনডিটিভি ২৪×৭ ইয়াকুবের ফাঁসিকে 'দুর্ভাগ্যজনক' আর এন ডিটিভি ২৪×৭ ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা করেছে।

বাঘা যতীন— আত্মনিবেদনের শতবর্ষ

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিচিত হয়েছিলেন বাঘ মেরে, বাঘা যতীন নামে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাঘা যতীন-এর মুখঃনিঃসৃত 'আমরা মরব, দেশ জাগবে'-র মতো বাণীর সার্থক প্রতিফলন খুব কমই দেখা গিয়েছে। ১৯১৫ সালে বুড়িবালামের তীরে সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামের শহীদ বাঘা যতীন-এর আত্মবলিদানের শতবর্ষ পূর্তির মাহেন্দ্রক্ষণ এবছরই। সেই উপলক্ষে আমাদের বিশেষ সংখ্যা। লিখেছেন— চন্দ্রমৌলী উপাধ্যায়, অভিরূপ নাগচৌধুরী প্রমুখ। থাকবে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও ছবি। সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা। সত্বর কপি বুক করুন

প্রকাশিত হবে ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৫

প্রধানমন্ত্রী-র ঘোষণা

গত ১৫ আগস্ট দেশের ৬৯ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লীর লালকেল্লা থেকে তাঁর ভাষণে দেশগঠনের যে অঙ্গীকার করেন, তারই কিছু ঝলক :

(১) ভারতবর্ষে যে ১৮,৫০০ গ্রাম এখনও অন্ধকারে ঢেকে যায় সূর্য ডুবলেই, আগামী ১০০০ দিনের মধ্যে সেইসব গ্রামে পৌঁছে যাবে বিদ্যুৎ। (২) জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করে তুলতে ৪৪টি শ্রম আইনকে চারটি ধারায় প্রতিস্থাপন করা হবে। (৩) নিদেনপক্ষে ৫০,০০০ কোটি টাকার প্রধানমন্ত্রী কৃষি সঞ্চয় যোজনার পরিকল্পনা। (৪) কৃষি মন্ত্রকের নাম পাল্টে হবে কৃষি ও কৃষক-উন্নয়ন মন্ত্রক। নামের মধ্যেই মন্ত্রকের উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে। (৫) প্রধানমন্ত্রীর জন ধন যোজনায় ১৭ কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। স্বাভাবিকভাবেই দেশের আর্থিক প্রগতি-তে বিষয়টি সহায়ক হবে। (৬) এল পি জি ভরতুকি সরাসরি ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টে চলে আসার প্রকল্পে খরচ বেঁচেছে ১৫০০০ কোটি টাকা। (৭) রাজ্যগুলির সহযোগিতায় দেশের সমস্ত স্কুলে শৌচালয় নির্মাণের প্রকল্প প্রায় সম্পূর্ণ। (৮) এন ডি এ ক্ষমতায় আসার আগে সি বি আই-এর হাতে বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্ত-সংখ্যা ছিল ৮০০-র কাছাকাছি। গত এক বছরে সেটা বেড়ে হয়েছে ১৮০০। (৯) দেশের সোওয়া এক লক্ষ ব্যাঙ্ক-শাখার প্রত্যেকটি শাখা একজন জনজাতি এবং একজন মহিলা উদ্যোগপতিকে উৎসাহিত করবে। (১০) ২০২২ সালের মধ্যে দেশের প্রত্যেক নাগরিক মাথার ওপর ছাদ (অর্থাৎ বাড়ি) এবং তাঁদের মৌলিক চাহিদাগুলি (যেমন বিদ্যুৎ) পাবেন।

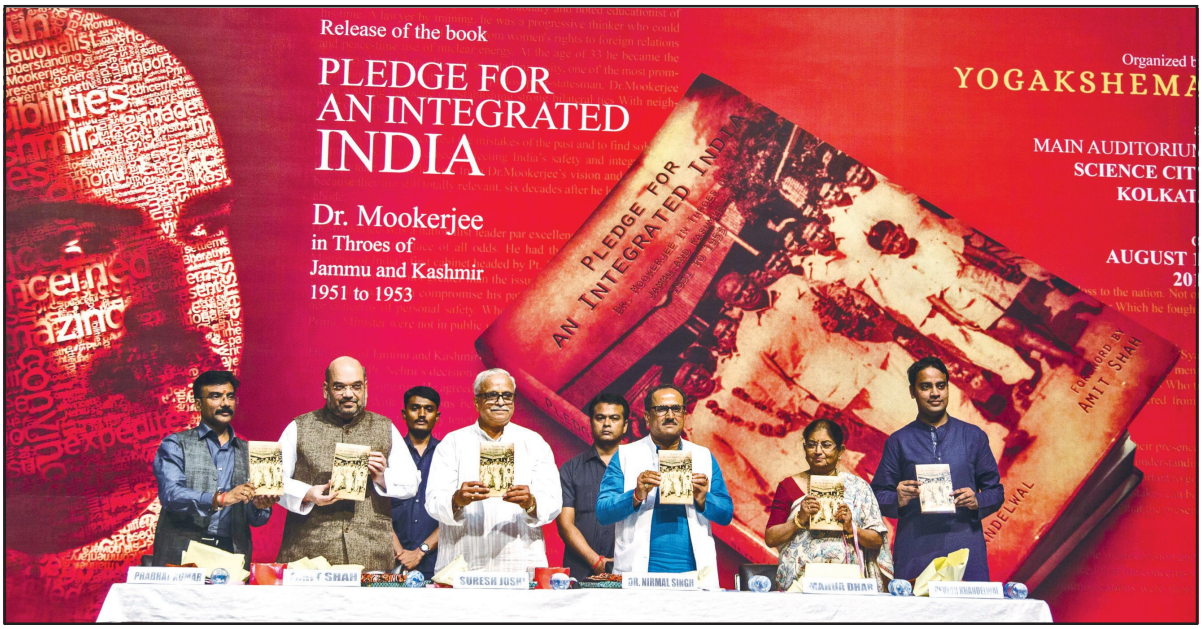

কাশ্মীর বিষয়ক বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী (বাঁ দিক থেকে তৃতীয়), বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ ও জম্মু-কাশ্মীরের উপ-মুখ্যমন্ত্রী নির্মল সিং। গত ১২ আগস্ট কলকাতার সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠানটি হয়।

জাল নোট পাচারে অপরাধীদের আড়াল করা হচ্ছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা॥ মালদা জেলার ইংলিশ বাজার কালিয়াচকের তিনটি ব্লকে প্রায় প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার জাল নোট বাংলাদেশ সীমান্তে ধরা পড়লেও আসল আসামীরা অধরা থেকে যাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে আসা এই সব জাল নোট মালদা জেলা হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। যেসব জাল নোট পাচারকারী ধরা পড়ছে তারা বেশীর ভাগই টাকা একস্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করার সময় পুলিশের জালে ধরা পড়ছে। বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন এবং পশ্চিমবঙ্গের উগ্র ধর্মীয় সংগঠনের বড় চক্র এর পিছনে রয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ আসল অপরাধীদের আড়াল করছে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে এইসব জাল নোট বাহকদের আদালতে পাঠাচ্ছে বলে অভিযোগ। সম্প্রতি বেশ কিছু হিন্দু যুবক টাকার প্রলোভনে জাল নোট বাহক হিসাবে ধরা পড়েছে। তারাই বলছে আমাদের কাছ থেকে পুলিশ ২০-২৫ লক্ষ টাকা ঘুষ চাইছিল এবং না দিতে পারায় আমাদের জেল খাটতে হচ্ছে। শুধু জাল নোটের ক্ষেত্রেই নয়, সিআইডি অফিসাররাও এখানে অপরাধীদের ঘুষ খেয়ে গুরুদণ্ডকে লঘু দণ্ডে পরিণত করে সেইভাবে চার্জ শিট পাঠাচ্ছে। মালদা জেলার বেশ কয়েকটি হিন্দু নাবালিকা মুসলিম যুবকদের দ্বারা অপহৃত হওয়ার পর সেইসব নাবালিকাদের দেড় থেকে দুই বছর পর সিআইডি হাজির করে (১৮ বছর পার করে) আদালতে নিয়ে আসছে এবং পরবর্তিতে মুসলমান যুবকটির সঙ্গে তারা যেতে বাধ্য হচ্ছে।

পুরভোটে মধ্যপ্রদেশে রেকর্ড জয় বিজেপি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রবেশিকা ও সরকারি চাকরি পরীক্ষায় টাকার বিনিময়ে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি বা চাকরি দেওয়া হয়েছে— এই অভিযোগ তুলেছিল কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশ ব্যবসায়িক পরীক্ষা মণ্ডল বা ব্যপম-এর বিরুদ্ধে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের পদত্যাগের দাবি করে সংসদের বাদল অধিবেশন অচলও করে দেয় কংগ্রেস। মনে করা হয়েছিল এই কেলেঙ্কারির জেরে মধ্যপ্রদেশে বিজেপি-র ভরাডুবি হবে কিন্তু জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াদের কার্যত শূন্য হাতে ফিরতে হলো। ১০টি পুরসভার মধ্যে ৮টিতে জয় পেল বিজেপি এবং বাকি ২টিতে জয় কংগ্রেসের। আগে আরও ৮টি পুরসভার দখলে ছিল বিজেপি-র। সুতরাং ১২ আগস্ট যে পুরভোট হয়েছিল সেই ভোটের আটটি এবং আগের ৮টি পুরসভা মিলিয়ে মোট ১৬টি পুরসভা দখল করল বিজেপি। যে ফলাফল দেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত। তিনি টুইট করে বিজেপি-তে আস্থা রাখার জন্য মধ্যপ্রদেশের জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ব্যপম কেলেঙ্কারিতে যে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল তার জন্যে শাসকদল বিজেপি-কেই দায়ী করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেস ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি ব্যাপম কেলেঙ্কারিতে বিজেপি-র প্রসঙ্গ বার বার টেনে এনে কার্যত তারা বিজেপি-কেই প্রচারের আলোতেই এনেছিল। মানুষের কাছে বিজেপি-কে খাটো করে দেখাতে গিয়ে কখন যে নিজেদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে তা আদৌ বুঝে উঠতে পারেননি কংগ্রেসের পোড় খাওয়া নেতারা।

পক্ষপাতদুষ্ট সাংবাদিকরা জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক

ইন্টারনেটের সোশ্যাল সাইটে বেশ কিছু স্বঘোষিত মানবাধিকার সমর্থক মুম্বই বিস্ফোরণের (১৯৯৩) অন্যতম প্রধান চক্রী ইয়াকুব মেমনের ফাঁসির তীব্র বিরোধিতা করে চলেছেন। তাঁদের মন্তব্য পড়লে মনে হবে ইয়াকুব নির্দোষ মহৎ ব্যক্তি ছিল। বাস্তবে এই লোকটি এবং তার পরিবার অযোধ্যায় বাবরিধাঁচা ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতে প্রায় ৭০০ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল। 'এই সময়' বাংলা দৈনিকে তার সম্পাদকমশাই পাতাজোড়া দীর্ঘ প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, মুসলমানকে ফাঁসিতে ঝোলালে ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের 'রমণ-সুখ' অনুভব হয়। এইসব বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকরা কিন্তু জানেন যে তাঁদের এমন অর্বাচীন মন্তব্য শুধুই দেশ বিরোধী নয়, দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে। তাঁরা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন যে সুপ্রিম কোর্টের তিনজন প্রবীণ বিচারপতি মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত অপরাধের চুলচেরা বিচার করে ইয়াকুব মেমনের ফাঁসির হুকুম বহাল রেখেছেন। সম্পাদকমশাই এই বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছেন। এবং দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর যে সম্পাদক মশাইয়ের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

২৬/১১-র মুম্বইয়ে একের পর এক হামলা চালানোর পর পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল পাকিস্তানের লস্কর জঙ্গি আজমল কাসব। দীর্ঘ বিচারের পর তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তখনও এইসব বুদ্ধিজীবীরা কাসবের ফাঁসির বিরোধিতায় সরব হয়ে হিন্দুত্ববাদীদের দিকে আঙুল তুলেছিল। সম্প্রতি জম্মুর উধমপুরে অনেকটা একইভাবে বিএসএফের কনভয়ে হামলা চালানোর পরে জীবন্ত ধরা পড়ে পাক লস্কর জঙ্গি নাভেদ। ঘটনাটি বেশ নাটকীয়। দুই লস্কর জঙ্গি সীমান্ত পার করে জম্মুতে ঢুকে পড়ে। তারপর বিএসএফের একটি বাসকে লক্ষ্য করে এ কে-৪৭ রাইফেল থেকে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করে। গ্রেনেডও ছোড়ে। দু'পক্ষে গুলির যুদ্ধে মারা পড়েন দু'জন বিএসএফ কনস্টেবল। বিএসএফের গুলিতে মারা যায় এক জঙ্গি। ধৃত জঙ্গি নাভেদ প্রাণ বাঁচাতে পণবন্দি করে তিনজন গ্রামবাসীকে। তাদের বলে পাক

গূঢ় পুরুষের কলম

সীমান্ত পর্যন্ত পথ দেখাতে। কিন্তু পণবন্দি ওই তিন গ্রামবাসী বুদ্ধি করে নাভেদকে ভুল পথে নিয়ে যান। তারপর সুযোগ বুঝে ওই তিন গ্রামবাসী একজোট হয়ে আচমকা নাভেদের উপর চড়াও হয়। তাকে শুইয়ে ফেলে মাটিতে ঠেসে ধরে বন্দুকটা তারা ছিনিয়ে নেয়। বন্দুক কেড়ে নেওয়ার সময় নাভেদ গুলি চালায়। সৌভাগ্যবশত কেউ হত হয়নি। এই অসমসাহসী তিন গ্রামবাসীর নাম রাজেশ শর্মা, বিক্রমজিৎ সিং এবং রাজেশ কুমার। পণবন্দি হওয়া দুই রাজেশই ওই এলাকার গ্রাম সুরক্ষা কমিটির সদস্য। তাঁরা প্রাণের বাজি রেখে পাক জঙ্গিকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

'এই সময়' দৈনিকের সম্পাদক মশাই নিশ্চয় লিখবেন যে জীবনের মায়া ত্যাগ করে সশস্ত্র লস্কর জঙ্গিকে ধরার পর দুঃসাহসী তিন গ্রামবাসী 'রমণ-সুখ' অনুভব করেছিলেন। কারণ, তাঁরা হিন্দু এবং ধৃত জঙ্গি মুসলমান। এইসব পক্ষপাতদুষ্ট সাংবাদিকদের জেলে পোরা উচিত কিনা আপনারাই বলুন। এঁরা জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। ধরা পড়ার পর নাভেদ বলে, ভারতীয় কাফেরদের খুন করতে বেশ মজাই লাগে। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এসেছিলাম। আমি আল্লার নির্দেশে হত্যা করতে এসেছিলাম। প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রতিশোধ কার বিরুদ্ধে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ইয়াকুব মেমনের ফাঁসির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতেই দুই পাক জঙ্গি ভারতে এসেছিল। 'এই সময়' দৈনিকের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর নাভেদ ওরফে উসমান ওরফে কাসিম গর্বের সঙ্গেই বলে, 'পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের মারতে এসেছিলাম। আমার সঙ্গী গুলিতে মারা গেলেও আমি বেঁচে গিয়েছি। আমিও যদি মারা যেতাম তা হলে ভাবতাম আল্লার কাজ করতে গিয়েই মরেছি। এসব করতে বেশ মজাই লাগে'। প্রতিবেদনটি দৈনিকের ৬ আগস্ট তারিখে ১২ নম্বর পাতায় ছাপা হয়েছে। সম্পাদক মশাই নিজের কাগজটি মন দিয়ে পড়েন কিনা জানি না। পড়লে হয়তো লিখতেন না যে মুসলিম জঙ্গিদের ফাঁসিতে ঝোলালে দেশের হিন্দুত্ববাদীরা রমণ সুখ অনুভব করে। পাক জঙ্গিরা হিন্দুদের হত্যা করতে মজা পায়। সম্পাদক মশাই এমন মজাতে কোনো দোষ খুঁজে পান না। কিন্তু পাক জঙ্গিদের নরহত্যার অপরাধে ফাঁসিতে ঝোলানো এইসব লেখক বুদ্ধিজীবীদের কলম প্রতিবাদে ঝলসে ওঠে। তাঁরা ভুলে যান যে গণতান্ত্রিক ভারত শান্তি নীতিতে বিশ্বাস করে। উধমপুরের ঘটনার পরেও দিল্লীতে ২৩-২৪ আগস্ট পাকিস্তানের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্তরের বৈঠক ভারত বহাল রেখেছে। অথচ সীমান্তে ধারাবাহিকভাবে অস্ত্র বিরতি লঙ্ঘনে কোনো বিরাম দিচ্ছে না পাকবাহিনী। চলতি আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ১১ বার অস্ত্র বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে পাক বাহিনী। জুলাই মাসে মোট ১৮ বার পাকিস্তানের অস্ত্র বিরতি লঙ্ঘনে তিন জন বিএসএফ জওয়ান-সহ চারজন নিহত হন। তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবী এবং মানবাধিকার সমর্থকদের এইসব তথ্য মনে থাকে না কেন বোঝা যায় না। ■

গান্ধী পরিবারই দেশের রাজা হোক

মাননীয় রাষ্ট্রপতি
শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়
রাইসিনা হিলস, নয়া দিল্লী

আপনাকে ৬৯তম স্বাধীনতা দিবসের অভিনন্দন ও প্রণাম।

আপনাকে আরও একটা প্রণাম আপনার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের জন্য। সেদিন আপনি যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, আমার তখন বারবার মনে হচ্ছিল এই ভাষণ, জাতির উদ্দেশে নয়, জাতির মাথাদের উদ্দেশে। দেশের মাননীয় সাংসদদের উদ্দেশে।

আপনি সেদিন বলেছেন ইদানীং সংসদ যেন 'রণক্ষেত্র' হয়ে উঠেছে। সেখানে আলোচনা হয় না তার পরিবর্তে লোকসভা, রাজ্যসভা যেন শক্তি প্রদর্শনের আখড়া। গণতন্ত্রের পীঠস্থানের ওপর এমন চাপকে দেশের জন্য, জাতির জন্য বিপজ্জক বলে আপনি মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি মহোদয়, আপনার কি মনে হয় আপনার এই বার্তা সাংসদদের কানে ঢুকবে? কানে ঢুকলেও তা কি হৃদয় স্পর্শ করবে?

এই মুহূর্তে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি-র নেতৃত্বে এনডিএ ঠিক একই কথা বলছে বিরোধী তথা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কিন্তু আপনি দেশের প্রথম নাগরিক। আপনার কথার মধ্যে কংগ্রেস নেতৃত্ব বিজেপি-র বক্তব্যের ছায়া পেয়ে মনে করছে সরকারের পরামর্শেই আপনি এমন কথা বলেছেন। কিন্তু আমি জানি, সংসদের ভাষণের ক্ষেত্রে সেটা নিয়মমাফিক হলেও স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ রাষ্ট্রপতি নিজের পছন্দ মতোই দিয়ে থাকেন। তাছাড়া আপনার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন, দীর্ঘ সাংসদ জীবনই আমাদের দেখিয়েছে প্রয়োজন মতো সহযোগিতা করলেও মাথা নত করা আপনার ধাতে নেই। একই সঙ্গে যত বিরোধিতাই থাকুক না কেন আলোচনাকে আপনি কখনও এড়িয়ে যেতে চাননি।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি মহাশয়, আপনার প্রাক্তন দলের হাতে সংসদ অচল করা ছাড়া কীই বা উপায় আছে। লোকসভায় তাদের শক্তি মাত্র ৪৪। নিয়ম অনুসারে প্রধান বিরোধীদলের মর্যাদাটুকু পাওয়ার যোগ্যতাও নেই। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বলতে যা বোঝায় সেটাই অবস্থা সোনিয়া গান্ধীদের। আপনি তো গান্ধী পরিবারকে অনেক কাছ থেকে অনেককাল ধরে দেখেছেন। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, ওই পরিবার মনে করে গণতান্ত্রিক ভারতের রাজপরিবার তারা। তারাই একমাত্র ক্ষমতায় থাকার অধিকারী। সেজন্য দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেননি এই পরিবারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। এমনকী সরকারের আনা অর্ডিন্যান্স প্রকাশ্যে ছিঁড়ে ফেলে গান্ধী পরিবারের যুবরাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁরাই শেষ কথা। পারুন বা না পারুন তাঁদের নেতৃত্বই মেনে নিতে হবে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস সে ক্ষমতা দেশ তাঁদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে এবং দেশের রাজনৈতিক ছবিটা এখন হয়তো এটা চিরকালের জন্য। তাই তো মরিয়া হয়ে উঠেছে 'মা-বেটা'র দল।

গত লোকসভা নির্বাচনে 'মা-বেটা' নিজেদের জয় নিশ্চিত করতে মুলায়ম সিং পরিবারের সঙ্গে অলিখিত জোট করতে বাধ্য হয়েছে। আর তাতেই দুই পরিবারের ছ'জন ছাড়া গোটা রাজ্যে একটি আসনেও বিজেপি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো দল জয় পায়নি। এর আগে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে মাথা নত করে কংগ্রেস টিকে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু মহাকরণ দখলের পর আক্ষরিক অর্থেই কংগ্রেসকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন বিহার বিধানসভা নির্বাচনেও নীতিশ-লালু জোটের কাছে কোনো দাবি নেই কংগ্রেসের। 'ভিক্ষার অন্ন যতটুকু পাওয়া যায়' এই নীতি নিয়েই হাতে গোনা ক'টি আসনে লড়ার টিকিট পেয়েই হাসি মুখ কংগ্রেসের।

অনেক বলেছেন, পরিস্থিতি এমন যে, ১০ নম্বর জনপথের এখন পাগল পাগল অবস্থা। একদিকে ক্ষমতার থেকে অনেক দূরে। ওদিকে আবার জামাই রবার্ট কেলেঙ্কারিতে ফেঁসেছে। তাই নিজের পদমর্যাদা ভুলে সোনিয়া গান্ধী লোকসভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। মায়ের মাথা ঠাণ্ডা করতে ছেলে রাহুল কাঁধে হাত রাখতেই সরিয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে কোনো দলের প্রথম সারির নেতানেত্রী আরও ছোট করে গান্ধী পরিবারে কোনো সদস্য এভাবে লোকসভায় ওয়েলে নেমে হল্লা করছেন এমন নজির নেই। এই প্রথম। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না গান্ধী পরিবারের পুত্রবধূ। শুধু কি ওয়েলে? গান্ধী মূর্তির সামনে ক'টাদিন যা করলেন তা চিরকালের জন্য ফ্রেমবন্দি হয়ে রইল। আপনারা ভেবেছিলেন, ব্যাপম কাণ্ড নিয়ে হইচই করে রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া যাবে। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের পুর নির্বাচনে বিজেপির কাছে ধুয়ে মুছে গেছে কংগ্রেস। রাজ্যবাসীই বুঝিয়ে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংয়ের প্রতিই তাদের আস্থা।

তবে একটা কথা। ২৫ জন সাসপেন্ড সাংসদের তালিকায় আপনার ছেলে অভিজিতের নামটা দেখে নিশ্চয়ই আপনার খুব কষ্ট হয়েছিল। সংসদকে 'রণক্ষেত্র' বানানোর জন্য তাঁকে বকবেন না প্লিজ। তিনিও যে নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশই শুধু মেনেছেন। আপনি পারলে গান্ধী পরিবারকে দেশের রাজপরিবারের মর্যাদা দেওয়ার উদ্যোগ নিন। ওঁরা একদম ভালো নেই।

— **সুন্দর মৌলিক**

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ত্রাণকাজে সরকারি ব্যর্থতা

দেবব্রত ঘোষ

বন্যা এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় যা অবশ্যম্ভাবী, কারণ আমাদের রাজ্য নদীমাতৃক এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী ও একই সঙ্গে হিমালয় সংলগ্ন। বন্যা রোধ করার কোনো টেকনোলজি অনাবিষ্কৃত। কিন্তু বন্যাকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করা যায়, পুরোটা না হলেও অনেকটা যায়, তেমনি বন্যাচলাকালীন ও বন্যা পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতিকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে। ২০১৫ সালের রাজ্যব্যাপী যে ভয়াল বন্যার ধ্বংসাত্মক চেহারা আমরা দেখলাম

> **রাজ্যের ত্রাণ নিয়ে নির্লজ্জ দলবাজি ও মিথ্যের বেসাতি বাংলাকে কলঙ্কিত করছে। আজকের মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী আসনে বসতেন তখন বলতেন 'ম্যান মেড বন্যা'। আজ তিনি উল্টো সুরে গাইছেন। কেন?**

তার দায় রাজ্য সরকার এড়াতে পারে না। এটা অতি বাস্তব সত্য যে বন্যা হওয়া মানেই শাসকদলের অনেক নেতা কর্মীর পকেট ভরে যায় বিপুল অর্থাগমের মাধ্যমে। ত্রাণ সামগ্রী কেনা, তার সরবরাহ ও বিতরণ-পদ্ধতি শাসকদল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের মাধ্যমে হয় বলে এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাজ্যে (আসলে দলতান্ত্রিক) টাকা নয়ছয়ের পরিমাণ ব্যাপক। কয়েক লক্ষ মানুষ গৃহহীন। এই ক্ষতি তৃণমূল সরকারের ব্যর্থতা।

প্রথমেই আসি কলকাতার কথায়। দক্ষিণে টালীনালার সংস্কার বহু বছর হয় না। উত্তরেও এক অবস্থা। খালগুলো তার গভীরতা হারাচ্ছে ফলে তার জলধারণ ও জল প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে, বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থে খাল, ডোবা, ড্রেন বা নালাগুলো ভরে ওঠায় সেগুলো তার নাব্যতা হারাচ্ছে ফলে জল জমেই থাকছে। দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও দুই মেদিনীপুর জেলা বন্যাপ্রবণ তার ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূতাত্ত্বিক গঠনের জন্য। কিন্তু বছরের পর বছর এই জেলাগুলোর নদী, খাল, নালা, বিলগুলোর সংস্কার করা হয় না। ফলে তাদের গভীরতা কমছে। পলিমাটি জমে ক্রমশ নাব্যতা কমছে। নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে ভূমিক্ষয় বাড়ছে যার ফলে নদীর পাড় ভাঙছে। নদী ও খালগুলোর যদি সংযোগ স্থাপন করা যেত তাহলে সহজেই জলমগ্ন এলাকার জমে থাকা জল খাল বাহিত হয়ে নদীতে মিশে পরে সমুদ্র প্রবাহে মিশে যেত। যেসব ডোবা বা অব্যবহৃত বা অল্পব্যবহৃত পুকুর রয়েছে সেগুলোর গভীরতা বাড়ালে ও আবর্জনা মুক্ত করলে জলজমার সমস্যা কমত। বন্যার বীভৎসতা অনেকটা কমতো। সেচ দপ্তর কী করছিল?

সংস্কার সাধন ও অন্যান্য কারণে রাজ্যের অনেক নদী শুকিয়ে গেছে, পলি বা বালিজমে নদীগুলোর গভীরতা কমেছে, কমেছে জলধারণ ও বহনের ক্ষমতা। ফলে গ্রামাঞ্চলে জমা জল আর নদীগুলোতে যেতে পারছে না। নদী তার স্বাভাবিক চরিত্র হারিয়েছে। জলাজমি বেআইনি ভরাট করে বহুতল নির্মাণের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে।

নদীতে যে অবস্থানে বাঁধ দেবার কথা, যেভাবে বাঁধ তৈরি করার কথা, যে উপাদান যতটা পরিমাণে ব্যবহার করে বাঁধ নির্মাণ করার কথা সেভাবে রাজ্যে বাঁধ নির্মাণ হয় না। যেটা হয় তার সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে অল্প বৃষ্টিতে ওইসব বাঁধ ভেঙে দুকূল প্লাবিত করে। বাঁধ বা নদীতীরবর্তী জলাধার ও ব্যারেজ নির্মাণে টেকনিক্যাল ত্রুটি তো থাকেই, এর সঙ্গে রয়েছে ঠিকাদার ও রাজনৈতিক মাথাদের বোঝাপড়ার মাধ্যমে টাকার লেনদেন। বরাদ্দ টাকার আর্ধেক চলে যায় নেতাদের পকেটে, বাকি আর্ধেক টাকায় রদ্দি মালমশালা, বাজে ইট, ভেজাল সিমেন্ট, নিম্নমানের রড ও বালি দিয়ে অদক্ষ শ্রমিক ও ঘুষখোর ইঞ্জিনিয়ারের দল যা তৈরি করে তার কার্যক্ষমতা ও স্থায়িত্ব দুটোই কম। ফলে বন্যা বা অতিবর্ষণ তার কাজ সহজেই করে যায়। শাসকদলের ভাঁড়ার সমৃদ্ধ হয়। ভোটার মরে। এই ক্ষতি হোত না রাজ্যের গৃহনির্মাণ দপ্তর গ্রামে পাকা বসতবাড়ি নির্মাণ করলে। তৃণমূল কংগ্রেস কলকাতা পৌরসভায় ক্ষমতাসীন রয়েছে ৬ বছরের বেশি। মেয়রও একই পদে ৬ বছর বহাল। দামি শৌখিন পোশাকে, দামি গাড়িতে চেপে তিনি যাতায়াত করেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহ ও অনুগ্রহভাজন এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা পরিবেশ বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর কোনো জ্ঞান

বা বোধ নেই। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। ভাষণ বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারিগরী ও প্রশাসনিক যোগ্যতা বা দক্ষতা তাঁর নেই। শহরের অধিকাংশ রাস্তা, গলি, কানাগলি যানবাহন তো বটেই মানুষ চলাচলেরও অযোগ্য। খানাখন্দ, গর্তে ভরা সড়কপথ তাপ্পি দিয়ে সাময়িক সারানো হয় এবং সেখানেও সরকারি অর্থের অপচয় ও নয়ছয়। গ্রামের অবস্থা আরো করুণ। পাকা সড়ক পথ প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম, যেটুকু পাকা সড়কপথ রয়েছে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির অভাবে সেগুলো জরাগ্রস্ত। ১০ মিনিটের পথ অতিক্রম করতে ১ ঘণ্টা লেগে যায়, বন্যা হলে তো সেটা ২/৩ ঘণ্টাও লেগে যায়। বেহাল সড়ক পথ রক্ষণাবেক্ষণে সরকারের পূর্ত বা নগরোন্নয়ন দপ্তর উদাসীন ও নির্বিকার। পথ দুর্ঘটনা এখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়াতে এক কলেজ ছাত্রী জলে ডোবা রাস্তায় পড়ে প্রাণ হারালো, বুঝতেই পারলো না বেচারি পাকা সড়কে এক প্রাণঘাতী গর্ত আছে। মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে ১টি শিশু প্রাণ হারালো। এর দায় কি রাজ্য সরকার এড়াতে পারে?

মুখ্যমন্ত্রীর ঠোঁটের আগায় একটাই কথা লেগে আছে ''সরকারের টাকা নেই''। যদি তাই হবে তাহলে মেলা উৎসব, খেলা উৎসব, মাটি উৎসব, বঙ্গভূষণ উৎসব, রাখি উৎসব, সাইকেল প্রদান, ইমাম ভাতা, ক্লাব অনুদানে কয়েক হাজার কোটি টাকা কীভাবে খরচ করে রাজ্য সরকার? সেই অপব্যয়িত অর্থে রাজ্যের অন্তত ৩০ শতাংশ সড়ক ও খাল, নালা সংস্কার করা যেতো। অন্তত কয়েকটা নদীতে ড্রেজিং করা যেত। বন্যার পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা হলেও পূরণ করা যেত। ত্রাণকাজে যে অর্থ সরকার বরাদ্দ করে সেই অর্থ কেন বন্যারোধে বা বিপর্যয় রোধে খরচ করা হয় না। Prevention is better than cure —এই আপ্তবাক্য কি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর জানা নেই! বোধহয় নেই— যিনি রবীন্দ্রনাথ, কীটস ও শেকস্‌পিয়ারকে সমকালীন বলে বসেন, সতীদাহ প্রথা বাংলা বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন, তাঁর কাছে চিরকালীন প্রবাদবাক্য মূল্যহীন হবারই কথা। তিনি বাম জমানার সার্থক এক উত্তরসূরী যার কাছে অজ্ঞানতাসুলভ ইগো আসল কথা। জনসমস্যার সমাধান গৌণ, আত্মতৃপ্তি মুখ্য।

ত্রাণকাজেও দলতন্ত্র। বিরোধীদলের কেউ যদি স্বেচ্ছায়, নিজেদের টাকায়, নিজেদের শ্রম ও চেষ্টায় দুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করতে যান সেখানেও তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা বাধা দেন। বিজেপি নেত্রী রূপা গাঙ্গুলী নিজের টাকায় ত্রাণসামগ্রী কিনে, নিজের টাকায় গাড়ির তেলপুড়িয়ে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করতে গেলেন দলীয়পতাকা ব্যবহার না করে, সেই রূপা গাঙ্গুলীকে কেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যক্ষভাবে বাধা দিল? কার অঙ্গুলি হেলনে এই অমানবিক বাধা প্রদান! রূপার অপরাধ কোথায়? ত্রাণ নিয়ে নির্লজ্জ দলবাজি ও মিথ্যের বেসাতি বাংলাকে কলঙ্কিত করছে। এই মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী আসনে বসতেন তখন বলতেন 'ম্যান মেড বন্যা'। আজ তিনি উল্টো সুরে গাইছেন কেন? তাঁর ভাষায় ডিভিসি মাত্রাতিরিক্ত জল ছেড়েছে বলে বন্যা। ডিভিসি ওই অতিরিক্ত জল না ছাড়লে অন্য বিপদ আসতো, সেটা তিনি কি করে রোধ করতেন? কেন ডিভিসি সংলগ্ন জেলায় নদী, নালা, খাল বিলের সংস্কার করা হয়নি? উত্তরবঙ্গে কেন জলনিকাশি ব্যবস্থা উন্নত নয়? কেন সেখানে বন্যা হয়? পূর্ত, সড়ক, সেচ দপ্তরে কেন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হয় না, কেন উন্নয়ন হয় না? মানছি আমাদের রাজ্যের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক চরিত্র বিচিত্র। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর মূলত শুকনো এলাকা। উত্তরবাংলা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা মূলত নদীবহুল। আবার বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, পূর্বমেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর ২৪ পরগনায় নদীর সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থা অত্যন্ত বাজে হওয়ায় উত্তরবাংলার মতোই বিপদসঙ্কুল। নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত না হলে অতিবৃষ্টি বন্যা ডেকে আনবেই। ড্রেজিং ও আবর্জনাদূরীকরণ খাল, নালা (যা নদীর সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত) ইত্যাদির নাব্যতা বা গভীরতা বাড়িয়ে অতিরিক্ত জলপ্রবাহকে নদীতে পাঠিয়ে দেয়, নদী আবার সমুদ্রে। নদীর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয় এমন খাল বা নালাগুলোকে নিকটবর্তী নদীর সঙ্গে যুক্ত করলেও সমস্যা মেটে অনেকটা।

এই কাজে রাজ্য সরকার অনাগ্রহী কেন? এই কাজে সরকার অর্থবরাদ্দ করে না কেন? কেন কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো অর্থ অন্য খাতে অপব্যয় হয়। জানি পশ্চিমবাংলা সরকার প্রতি বছরে বন্যারোধে ১০০০০ কোটি টাকা খরচ করতে অক্ষম, কিন্তু ২০০০ কোটি তো বরাদ্দ করতে পারে, করলে বন্য-পরবর্তী ত্রাণকাজে ব্যয়টাও অনেক কম হোত। আসলে এ রাজ্যে গণতন্ত্র নয় মাৎস্যন্যায় চলছে।

আবার বলছি, বন্যার কারণ অতিবৃষ্টি, একনাগাড়ে অকালবর্ষণ, মেঘভাঙা বর্ষা, ভরা কোটাল এবং আরো কিছু যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের অতীত, কিন্তু বন্যাজনিত বিপর্যয় বা ক্ষয়ক্ষতি রোধ তো মানুষের আয়ত্তে। অন্তত অনেকটাই যদি সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সঠিক ভাবে কাজে লাগানো যায়। পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো যদি বিজ্ঞানসম্মত হয় তবে বিপর্যয় রোধ করা যায়। আই এ এস, আই পি এস অফিসার দিয়ে সেটা হয় না, সেটা হয় আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে যেখানে Civil Engineer, Structural Engineer, River Science Speeialist-দের সমন্বয় জরুরি। পরিবেশ ও আবহাওয়া বিজ্ঞানের সমন্বয় জরুরি। অর্থনীতিবিদ অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু তারা স্বক্ষেত্রে মহীয়ান হলেও বিজ্ঞানী নন বা বন্যা-খরা বিশেষজ্ঞ নন্ যাঁরা সমাধান দিতে পারেন।

তৃণমূল সরকারে বহু আই এ এস, আই পি এস, ইকোনোমিস্ট আছেন। নেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সমৃদ্ধ কোনো উপদেষ্টা। যে রাজ্যে সব কাজেই গিমিকের প্রাধান্য, বাক্‌সমৃদ্ধ ও বাক্‌সর্বস্ব নেতাদের একাধিপত্য, মহানেত্রীর নেক্‌নজরে থাকাই আদি ও অকৃত্রিম লক্ষ্য— সে রাজ্যে এটাই স্বাভাবিক। ■

সংস্কৃত কলেজ নিয়ে সরকারের দ্বিচারিতা

নবকুমার ভট্টাচার্য

কলকাতা সংস্কৃত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা চলছে অথচ রাজ্যের অপর তিনটি সরকারি সংস্কৃত কলেজ বিলুপ্তির পথে। দেশে ভারতীয় বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান হিসেবে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের একটা ঐতিহ্য রয়েছে। ১৮২৪ সালের ১ জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজ গড়ে উঠেছিল। ১৯১ বছরের এই কলেজে এক সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষ হন। এক সময় এই প্রতিষ্ঠান থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পেয়েছিলেন কবি সার্বভৌম উপাধি। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে দেওয়া হয়েছিল সর্বাগম সার্বভৌম উপাধি, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু পেয়েছিলেন বিজ্ঞানভাস্কর উপাধি। অথচ আজ সেই কলেজেই ১০ বছর সংস্কৃত টোলের কোনো পরীক্ষাই হয়নি। টোলে ২২টি শিক্ষক পদে রয়েছেন মাত্র ৩ জন শিক্ষক। কলেজের গ্রন্থাগারে রয়েছে ২২ হাজার পুঁথি ও লক্ষাধিক বই। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অমূল্য সবকিছুই এখন নষ্ট হওয়ার মুখে। কলকাতার নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটে টোলের ছাত্রদের জন্য একটি হস্টেল ছিল। তাও প্রমোটারকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। তবুও কলকাতা সংস্কৃত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল বাম আমলেই। সেই সময় সংস্কৃত কলেজের এক অনুষ্ঠানে পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে সেদিনের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সংস্কৃত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়নি। আজও সেই একই ঘোষণা। সরকার পরিবর্তন হলেও সংস্কৃত নিয়ে সরকারি নীতির পরিবর্তন এখনও হয়নি। এরাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষায় সংস্কৃত এখনও ব্রাত্য রয়ে গেছে। সরকারি অবহেলা ও উদাসীনতায় রাজ্যের সংস্কৃত কলেজেগুলিও আজ ধ্বংসের পথে। অথচ সংস্কৃত ভাষাচর্চার উন্নতির জন্য একদিন সরকার নবদ্বীপ, কোচবিহার ও কাঁথিতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেছিল। কলকাতা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজ অবশ্য স্থাপিত হয়েছিল বহু পূর্বেই। তবে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ টোলবিভাগ নিয়ে স্থাপিত হলেও বর্তমানে টোলবিভাগটিই বেশি অবহেলিত। বহুপদ শূন্য রয়েছে, নিয়মিত পরীক্ষা না হওয়ায় ছাত্রসংখ্যা কমতে কমতে দু' একজনে ঠেকেছে।

অপরদিকে ইন্টারনেটের যুগে হারিয়ে যেতে বসেছে অক্সফোর্ড অফ বেঙ্গল অভিধায় পরিচিত নবদ্বীপের টোলে টোলে কল্লোলিত দেবভাষা। সংস্কৃতচর্চার পীঠস্থান এবং পণ্ডিতদের শহর নবদ্বীপ আজ পণ্ডিতশূন্য হওয়ার পথে। দিনে দিনে কমছে টোলের সংখ্যা। বছর দুয়েক আগে যেখানে টোলের সংখ্যা ছিল ২১টা, এখন তা ঠেকেছে ১০টায়। সরকারিভাবে টোলে অধ্যাপক নিযুক্ত না হওয়ায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ট্রাস্ট পরিচালিত টোলের সম্পত্তি। বেদখল হয়ে যাচ্ছে বাংলার ঐতিহ্য। পরিবর্তে সেখানে গড়ে উঠছে বহুতল বাড়ি, হোটেল, শপিংমল। পূর্ববর্তী বাম আমলে রাজ্যের ঐতিহ্যশালী নবদ্বীপের সরকারি সংস্কৃত কলেজটির কোনো সংরক্ষণ হয়নি, জোটেনি সামান্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও। কলেজ বিল্ডিংয়ের অবস্থা জরাজীর্ণ, ঘরদোর আগাছায় ভরা, কোথাও ভেঙে পড়ছে ছাদ। অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ অবসর নেওয়ার পর সরকার আর কোনো অধ্যাপক নিয়োগ না করায় আজ কুড়ি বছর এখানকার পঠন-পাঠন বন্ধ। এরই মধ্যে

কলেজের কিছু অংশে প্রমোটারির থাবা পড়েছে। অথচ বামসরকারের মতো বর্তমান সরকারও এ বিষয়ে উদাসীন। যদিও একদিন তুর্কি ও পাঠানদের ভীষণ অত্যাচার সহ্য করে নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ সংস্কৃত শিক্ষার

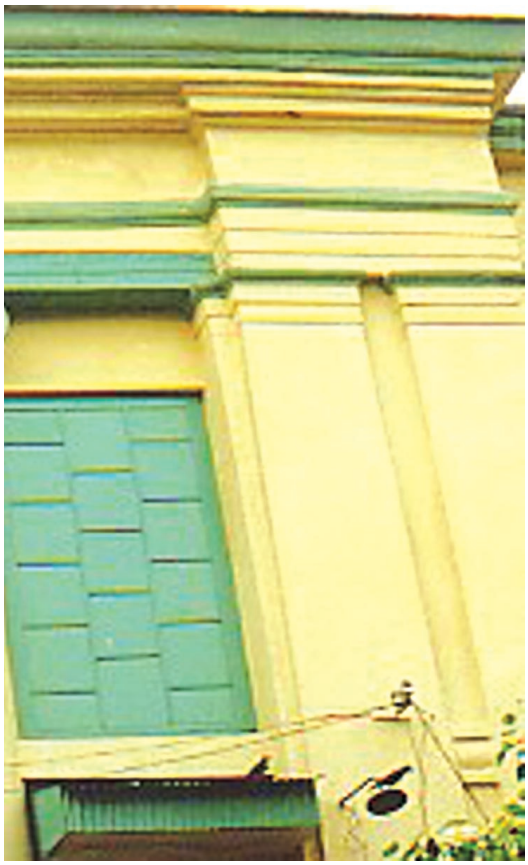

পুণ্যপীঠে জ্ঞানের প্রদীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। নব্য ন্যায়ের যে প্রতিভা বাংলাকে বিশ্বের দরবারে সম্মান এনে দিয়েছিল এই নবদ্বীপই ছিল সেই জ্ঞানের কর্ষণভূমি। ইংরেজ আমলে সংস্কৃত ও জ্ঞানচর্চার অবলুপ্তি রোধ করতে পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরা ১৮৮৬ সালে গঠন করেন সংস্কৃত বিদ্যাবিবর্ধনী বিদগ্ধজননী সভা'। পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ ছিলেন এর সভাপতি। ১৮৯৭ সালে নবদ্বীপের মহারাজা ক্ষিতীজচন্দ্র রায় সভাপতি হন এবং ওই সময়ে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'বঙ্গবিবুধ জননী সভা'। সম্পাদকের দায়িত্ব নেন পণ্ডিত সর্বেশ্বর সার্বভৌম। ১৯৩৫ সালে পুরাতন পাকা টোলের ঘর কিনে সেখানে 'সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ' স্থাপন করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২ নভেম্বর এখানে অমিয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আজ সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংসের পথে। এক সময় এই কলেজে সাতজন অধ্যাপক বিভিন্ন বিষয় পড়াতেন। নবদ্বীপের প্রখ্যাত অধ্যাপক ড. কুমারনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন, সরকারি উদাসীনতার ফলেই সংস্কৃত কলেজটির আজ এই অবস্থা। এভাবে নিজেদের ঐতিহ্য ধ্বংস করার প্রচেষ্টা কেন? নবদ্বীপের সংস্কৃত কলেজ আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, মূল্যবান সম্পদ। এভাবে জাতীয় ঐতিহ্য ধ্বংস করার প্রতিবাদ করেছেন অনেকেই। কিন্তু সরকার এখনও উদাসীন। কলকাতা সংস্কৃত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা প্রচেষ্টা চললেও নবদ্বীপ নিয়ে সরকারের এই উদাসীনতা কেন?

অন্যদিকে কোচবিহার রাজার আমলে তৈরি কোচবিহারের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজটি আজ সমাজবিরোধীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। দিন দুপুরে চলছে মদের ভাটি, কারণ সরকারের চরম উদাসীনতা ও সুষ্ঠু পরিকাঠামোর অভাবে কুড়ি বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে কলেজটি। বর্তমানে চুরি হয়ে গিয়েছে শ্রেণীকক্ষের দরজা ও জানালা। সমাজ বিরোধী ও গবাদি পশুর বর্তমানে অবাধ বিচরণভূমি কলেজ পরিসর। কোচবিহার রাজার আমলেই সংস্কৃতের যথেষ্ট চর্চা হোত এই এলাকায়। রাজা নরনারায়ণ ছিলেন একজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। শোনা যায় কোচবিহারে সংস্কৃত ভাষাচর্চা প্রসারের জন্য তিনি গৌড়দেশ থেকে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কোচবিহারে নিয়ে আসেন। অবশ্য প্রথম দিকে সংস্কৃত চর্চা হোত মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির পাশে। রাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যকে প্রসারিত করার জন্য শহরের কেন্দ্রস্থলে দেড় বিঘা জমি দান করে। স্থানীয় বিদ্বান ব্যক্তিদের উৎসাহে ১৯৫৭ সালে সংস্কৃত কলেজটি স্থাপিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, বেদান্ত দর্শন-সহ ১০টি বিষয় নিয়ে অধ্যয়নের পাঠ চলত এই কলেজে। পাঠদানের জন্য ছয়জন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। উত্তরবঙ্গের বহু ছাত্রছাত্রী এই কলেজে পঠনপাঠন করত। কিন্তু ১৯৮৫ সালের পর থেকে রাজ্য সরকারের চরম উদাসীনতার জন্য সংস্কৃত কলেজটি ধীরে ধীরে মৃতপ্রায় হতে থাকে যা ১৯৯০ সালের পর থেকে সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যায়। কলেজের লাইব্রেরি থেকে মূল্যবান বইগুলি চুরি হয়ে গেলেও সরকার এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। রাজ্য সরকারের এহেন আচরণে রীতিমতো ক্ষুব্ধ উত্তরবঙ্গের সংস্কৃত অনুরাগী মহল। রাজ আমলের স্মৃতিবিজড়িত সংস্কৃত কলেজটি পুনরায় চালু করার দাবিতে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃত অনুরাগীরা সরব হলেও সরকারের টনক এখনও নড়েনি। নবদ্বীপ ও কোচবিহারে সরকারি সংস্কৃত কলেজ দু'টি বন্ধ হয়ে গেলেও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির পণ্ডিত দিবাকর পঞ্চানন সংস্কৃত কলেজটি এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। তবে আগামীদিনে এই কলেজটিও বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে। ১৯৫০ সালে পণ্ডিত পঞ্চানন শাস্ত্রী ও পণ্ডিত জ্যোতির্ময় নন্দের প্রচেষ্টায় এবং পণ্ডিত দিবাকর বেদান্ত পঞ্চাননের আর্থিক সহায়তায় এই কলেজটি তৈরি হয়। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ। কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি, সাংখ্য, বেদান্ত ও জ্যোতিষ এই কয়টি বিভাগ নিয়ে কলেজের পঠনপাঠন আরম্ভ হলেও আজ মাত্র একজন অধ্যাপক রয়েছেন। কলেজ ভবনটির অবস্থা জরাজীর্ণ। পূর্বে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা থাকলেও বর্তমান ছাত্রাবাসটির অবস্থা অতীব শোচনীয়। গৃহের অভাবে মূল্যবান পুঁথিগুলি নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। নিয়মিত পরীক্ষা না হওয়ায় ছাত্রের অভাব রয়েছে।

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৬৫০টি বেসরকারি সংস্কৃত টোল রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই টোলগুলি অনুমোদন করেন এবং টোলের অধ্যাপকদের মাসে মাসে কিছু বৃত্তি দেন। সরকারি উদাসীনতা ও পরিকাঠামোর অভাবে সেগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার লাভ ভোটের বাক্সে পড়লেও সংস্কৃত কলেজ, সংস্কৃত চর্চা বা টোলের ক্ষেত্রে তা অচল, তাই হয়ত সরকার উদাসীন। মাদ্রাসা শিক্ষা, উর্দু চর্চার জন্য বার্ষিক ব্যয় ৫০০ কোটির বেশি হলেও সংস্কৃত কলেজ সংস্কৃতচর্চার জন্য মাত্র সাত কোটি। এই দ্বিচারিতা কেন? ■

সংস্কৃতি জাগরণে সংস্কৃত আজ আন্দোলনের পথে

প্রণব নন্দ

'সংস্কৃতম্'— আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, পুণ্যভূমি ভারতের আত্মা। ভারতের সনাতন সংস্কৃতির ধারক ও বাঙ্ময়তার অন্যতম পরিচায়ক সংস্কৃতভাষা। মানবতা, শান্তি, সর্বজনীনতার সমস্ত প্রেরণার স্রোত সংস্কৃত ভাষা।

উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরে আবাসীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ বর্গ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— ''ভারতবর্ষের চিরকালের যে ভাষা তাহার আশ্রয় সংস্কৃতভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব।'' পৃথিবীতে উদ্ভূত ভাষা জগতের ইতিহাসে প্রাচীনতম ভাষা হলো সংস্কৃত। কারণ পৃথিবীর প্রথম পুস্তক ঋগ্বেদ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতির অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের দ্বারস্থ হতে হবে বিশ্বের একমাত্র প্রাচীনতম সংস্কৃতভাষার কাছে। পুরাকালে আমাদের সমাজব্যবস্থা ছিল শাস্ত্র আধারিত, যা সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। আমরা ভারতবাসীরা চিরকাল বিশ্বকে এক ও অখণ্ড ভেবে এসেছি। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'— সকলকে অদ্বৈত ভাবনায়, সব কিছুকে এক রূপে দেখা— এটাই ভারতের সংস্কৃতি যা সংস্কৃতভাষার মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। তাই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে এই সংস্কৃত ভাষা ঐতিহ্যের ও গৌরবের।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে— ''ভারতে 'সংস্কৃত' ও 'মর্যাদা' সমার্থক। সংস্কৃতভাষায় জ্ঞান লাভ হইলে কেহই তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না। ইহাই একমাত্র রহস্য— এই পথ অবলম্বন কর।''

ভাষাকে কেন্দ্র করে বিশ্বে হয়েছে কত বিপ্লব কত আন্দোলন। অনেক নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে ভাষাকে সামনে রেখে। ভাষা হলো রাষ্ট্রের মর্যাদা, জাতির উন্নতির সোপান। বিদেশি শাসকেরা আমাদের ভাষাগত স্বাভিমানকে নষ্ট করেছিল। তারা হীন চক্রান্ত ও জঘন্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারতবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সেই প্রয়াস ব্যর্থ হতে চলেছে। বর্তমানে ভারতীয় সংস্কৃতির ও সংস্কৃতের ব্যাপক জাগরণই তার যথার্থ প্রমাণ দিচ্ছে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয়— আমাদের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণভোমরা স্বরূপ সংস্কৃতভাষা আজ স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তার জন্য শুরু হয়েছে এক বৈপ্লবিক আন্দোলন। সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের কাছে আমরা খুলে দিতে পারব এক নতুন দ্বার, উন্মোচিত করতে পারি এক নতুন দিগন্ত।

রবীন্দ্রনাথের কথায়--- বর্তমানের 'বিকৃত ভারতবর্ষ' এবার সাংস্কৃতিক ভারতে পরিণত হবে সংস্কৃত ভাষার হাত ধরে। পুনরায় স্বাভিমানী ভারত বিশ্বকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করে বলবে—

''শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যপুত্রাঃ
আ য়ে ধামানি দিব্যানী তস্থু।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসো পরস্তাৎ।।''

সংস্কৃতকে জনভাষা করার উদ্দেশ্যে আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি বিদ্যাপীঠের ২/৩ জন ছাত্র শুরু করেছিলেন সংস্কৃত সম্ভাষণ আন্দোলন। লক্ষ্য— সহজেই প্রত্যেক ভারতবাসীর মুখে মুখে ছড়িয়ে দেওয়া প্রাণস্বরূপিণী সুমধুর সংস্কৃত ভাষা। ১৯৮১ সালে গড়ে তুললেন সংস্কৃত ভাষা জাগরণে অনন্য সংগঠন 'সংস্কৃতভারতী' যা বর্তমানে সংস্কৃতভাষা আন্দোলনের অপর নাম বলেই সুপরিচিত। শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা সংস্কৃতভারতীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাগ্রহে সংস্কৃত শিখছেন। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সৌদিআরব, কাতার-সহ প্রায় ২৮টি দেশের অধিবাসীরা সংস্কৃতভারতী পরিচালিত সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরে সানন্দে অংশগ্রহণ করছেন। সংস্কৃতভারতীর কাজ আজ দ্রুত গতিতে সর্বত্র বিস্তারলাভ করছে।

ভারতীয় সংস্কৃতি তথা সংস্কৃতভাষা রক্ষায় 'সংস্কৃতভারতী' সমাজের কাছে এক আলোকবর্তিকা স্বরূপ, সংস্কৃত ভাষা আন্দোলনের রূপরেখা হিসাবে সংস্কৃতভারতী যে মুখ্য কাজগুলি করে চলেছে সেগুলি হলো—

সম্ভাষণ শিবির—

দশদিনের শিবির, প্রতিদিন দুই ঘণ্টা। কেবলমাত্র কুড়ি ঘণ্টার এক অভিনব পাঠ্যক্রম রচনা করেছে সংস্কৃতভারতী যার পোশাকি নাম 'সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরম্'। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা কথাবার্তা বলি সেগুলি সহজ, সরল পদ্ধতিতে অভিনয়ের দ্বারা উপস্থাপন, প্রয়োগ ও অভ্যাসের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ফলে অংশগ্রহণকারী সাধারণ মানুষেরাও সহজেই শুনে শুনে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করতে পারেন। আজ পর্যন্ত সারা ভারতে লক্ষাধিক সম্ভাষণ শিবিরের মাধ্যমে প্রায় এক কোটিরও অধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছরে প্রায় সপ্তশতাধিক শিবিরের মাধ্যমে প্রায় পঁচিশ হাজারেরও অধিক সংস্কৃতপ্রেমী বাঙালি সংস্কৃতভাষী হয়ে উঠেছেন এবং নিত্য জীবনে সংস্কৃতভাষার প্রয়োগ করছেন। যে সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ সংস্থা বাংলায় সংস্কৃতভারতীর সম্ভাষণ শিবির একাধিকবার চালানোর জন্য অকুণ্ঠ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন— তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রী অরবিন্দ ভবন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণমিশন শ্রী নিগমানন্দ আশ্রম, আদ্যাপীঠ, পরমার্থ সাধক সঙ্ঘ, কাঠিয়াবাবা আশ্রম, চৈতন্যমঠ, খড়্গপুর আই আই টি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জে বি রায় আয়ুর্বেদিক ম্যাডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি।

সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক এই সম্ভাষণ শিবির। এখানেই শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো বালাই নেই। বয়সের কোনো সীমা নেই। ছাত্র-শিক্ষক-পুরুষ মহিলা, কৃষক-শ্রমিক সকলেই সম্ভাষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করতে পারেন। শুধুমাত্র ২৫/৩০ জন সংস্কৃতপ্রেমীদের একত্রিত করে সম্ভাষণ শিবিরের আয়োজন করে সংস্কৃতভারতীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে উপযুক্ত শিক্ষক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

বালকেন্দ্রম্ (শিশু সংস্কার কেন্দ্রম্)

৭ থেকে ১২ বছরের ছোট ছোট শিশুদের মনে প্রথম থেকেই পরিচয় করানোর এক অনন্য উপক্রম হলো বালকেন্দ্রম্ বা শিশু সংস্কার কেন্দ্রম্। সংস্কৃত ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জাগরিত করে তোলা হয় সংস্কৃত ভাষায় গান, শ্লোক, প্রেরক গল্প ও খেলার মাধ্যমে। বিশেষত প্রশিক্ষিত বোনেরা স্থানীয় সময় অনুসারে স্বস্থানে ২০/২৫ জন শিশুদের নিয়ে সপ্তাহে একদিন দুই ঘণ্টার জন্য চালান। এরূপ পঞ্চশতাধিক 'বালকেন্দ্রম্' ভারতে নিয়মিত ভাবে চলছে যেখানে প্রায় দশসহস্রাধিক শিশুরা উৎসাহের সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে সংস্কার গ্রহণ করে চলেছে।

পুস্তক প্রকাশন

সমাজের সকলস্তরের শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত পড়ার জন্য সহজ ও সরল বোধগম্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুস্তকের প্রকাশন করেছে সংস্কৃত ভারতী। সংস্কৃতে ভাষাজ্ঞান, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে অসংখ্য পুস্তকের সাহিত্য ভাণ্ডার প্রকাশিত করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে গান, গল্প, নাটক, নৃত্যকলা ও ভাষা অভ্যাসের জন্য এবং বহুবিধ সিডি ও ডিভিডি-র প্রকাশ করেছে। যার দ্বারা সংস্কৃত প্রেমীদের কাছে এক নতুন জোয়ার এনেছে সংস্কৃতভারতী।

আবাসীয় প্রশিক্ষণ বর্গ

সহজেই সংস্কৃতভাষায় কথা বলার জন্য সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির চালানোর যোগ্য সঞ্চালক হিসাবে উপযুক্ত শিক্ষক নির্মাণের উদ্দেশ্যে ১০/১৫ দিনের আবাসীয় প্রশিক্ষণ বর্গ প্রতি প্রদেশে করে চলেছে সংস্কৃত ভারতী। সম্পূর্ণ সংস্কৃতময় বাতাবরণে এই প্রশিক্ষণ বর্গ চলে। জাগরণ থেকে রাত্রি শয়ন পর্যন্ত প্রতিটি নির্ধারিত সময়ে ঠাসা থাকে সাবলীল ভাবে সংস্কৃত শেখার বিবিধ কার্যক্রম। প্রশিক্ষিত সংস্কৃত শিক্ষক ও শিক্ষিকারা এই প্রশিক্ষণ বর্গ প্রতিবছর পরিচালনা করেন। সর্বদা সংস্কৃতভাষায় কথা বলতে বলতে নিজের অজান্তে কখন যে ধারাপ্রবাহ রূপে সংস্কৃতভাষায় কথা বলতে শিখে যায় তা শিক্ষার্থীরাও বুঝে উঠতে পারে না। সারা ভারতে প্রতি বছর আবাসীয় প্রশিক্ষণবর্গে অংশগ্রহণ করে হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিয়ে বর্তমানে ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে এক বৃহৎ বৈপ্লবিক আন্দোলনের রূপ দিতে পেরেছে সংস্কৃতভারতী যা সত্যিই বিস্ময়কর।

সংবাদশালা

সংস্কৃত ভারতীর পরিচালনায় সংস্কৃতভাষায় কথা বলার উত্তম অভ্যাসের জন্য সংস্কৃতময় পরিবেশে ১৪ দিনের আবাসীয় শিবির হলো সংবাদশালা। প্রতি মাসে দুইটি চক্র চলে বর্ষব্যাপী। প্রতি মাসের ১ থেকে ১৪ ও ১৬ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত এই শিবির চলে। বর্তমানে দুইটি স্থানে মনোরম পরিবেশে সংবাদশালা বিদ্যমান। (১) কাশী (গান্ধীবিদ্যা সংস্থান, রাজঘাট বারাণসী) যোগাযোগ-০৯৪৫২০৯৩৯৯৬, (২) দিল্লী (শ্রী দুর্গামন্দির সেবাধাম, সন্তোশী, মন্দনগরী, যোগাযোগ-০৮৮২৬৮৮৪০৪০ বর্তমানে দেশবিদেশের অসংখ্য সংস্কৃতপ্রেমী সংস্কৃত শেখার উদ্দেশ্যে সংবাদশালার প্রশিক্ষণে নিরন্তর অংশগ্রহণ করে চলেছে। মাত্র কয়েক বছর আগে শুরু হওয়া সংবাদশালার আজ পর্যন্ত ৩৫টি দেশের প্রায় বার হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে সংস্কৃত ভাষায় উত্থানে সংস্কৃত জগতে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

সম্ভাষণ সন্দেশঃ (সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা)

ছোট থেকে বড়ো সকলের জন্য সাহিত্য রসে পরিপূর্ণ বর্ণময় সরল সংস্কৃতভাষায় লেখা সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা 'সম্ভাষণ সন্দেশঃ'। অত্যন্ত সরল সংস্কৃতে গল্প, হাস্যকৌতুক আধুনিক বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত জগতের আধুনিক সমাচার এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত বর্তমানে সংস্কৃত জগতের একমাত্র পত্রিকা, বিশ্বে যার লক্ষাধিক গ্রাহক যা সত্যই সকল সংস্কৃতপ্রেমীদের পঠনপাঠনে উৎসাহের সঞ্চার করে।

সাপ্তাহিক মেলনম্

সংস্কৃতসম্ভাষণ শিবির বা সংস্কৃত প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর ব্যবহারিক জীবনে সংস্কৃতভাষা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কমপক্ষে সপ্তাহে একদিন ১/২ ঘণ্টা সংস্কৃতচর্চা বা অনুশীলনের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে সম্মিলিত হওয়ার অপর নাম সাপ্তাহিক মেলনম্। সংস্কৃত কার্যকর্তা নির্মাণের কেন্দ্রও বলা যেতে পারে। বহু সাধারণ মানুষেরাও সাপ্তাহিক মিলন

চালাতে পারেন এক আনন্দময় পরিবেশে। বর্তমানে সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃতভারতী আয়োজিত নিয়মিত সাপ্তাহিক মিশনে হাজার হাজার সংস্কৃতপ্রেমী মানুষেরা অংশগ্রহণ করছেন এবং সংস্কৃত ও সংস্কৃত জাগরণে এক মহত্তর ভূমিকা পালন করছেন।

সংস্কৃত আন্দোলনের ফলস্বরূপ বর্তমানে আশার আলো.....

* বর্তমানে সারাদেশে ১৬টি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

* ভারতের বাইরে বিশ্বের প্রায় ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয়।

* ভারতে প্রায় ১২৫টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগ আছে।

* ভারতে প্রায় ৫০০০ এর অধিক মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়ানো হয়।

* পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত চতুষ্পাঠী আছে ৭০০টি।

* সারা ভারতে ৩০০-এর অধিক বেদপাঠশালা আছে।

* আর্যসমাজ পরিচালিত ৩০০-র অধিক গুরুকুল বিদ্যালয় চলছে।

* ভারতে প্রায় ৮টি রাজ্যে 'সংস্কৃত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড' বিদ্যমান।

* উত্তরাখণ্ডের দ্বিতীয় সরকারিভাষা 'সংস্কৃত' ঘোষিত।

* কেরল, মণিপুর তথা কয়েকটি রাজ্যে প্রথমশ্রেণী থেকে সংস্কৃত পাঠ্য ও কয়েকটি রাজ্যে দ্বাদশশ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য।

* বিদ্যাভারতী পরিচালিত সারাদেশে প্রায় ২৫,০০০ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে সংস্কৃত পড়ানো আবশ্যিক।

* কর্ণাটকে মৈত্রেয়ী গুরুকুলে দশ বছরের মেয়েদের পাঁচ বছর পর্যন্ত সংস্কৃতের মাধ্যমে সমস্ত বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা।

* সংস্কৃতভারতী পরিচালিত প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য সরলা, সুগমা, সুখদা, সুবোধ'— চারটি সংস্কৃত পাঠক্রম পরীক্ষার দ্বারা সঞ্চালিত হয়। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই সংস্কৃত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে চলছে।

* ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথমঠ প্রভৃতি সংস্থাও সংস্কৃত পরীক্ষা সঞ্চালিত করে।

* সংস্কৃতভারতী পরিচালিত 'পত্রাচার দ্বারা সংস্কৃতম্' ডাকযোগে সংস্কৃত শিক্ষা, প্রায় আটটি ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে সারাদেশে পত্রাচার দ্বারা সংস্কৃতের ছাত্র লক্ষাধিক।

* সংস্কৃতভারতী পরিচালিত তামিলনাড়ুতে 'বালভারতী' পরীক্ষায় ২০,০০০ ও গুজরাতে 'সংস্কৃত গৌরব' পরীক্ষার ১৮,০০০ ছাত্রছাত্রী প্রতি বৎসর সাকল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়।

* সারাদেশে ৩০ টিরও অধিক সংস্কৃত পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

* বর্তমানে দূরদর্শনে প্রতি রবিবার (ডিডি ওয়ান) ৩০ মিটারে সংস্কৃত সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে।

* কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর সংস্কৃত বিদ্বানদের শতাধিক পুরস্কার প্রদান করে।

* বর্তমানে চারটি গ্রাম সংস্কৃত গ্রাম হিসাবে বিখ্যাত। যেখানে গ্রামের সকলেই সংস্কৃতভাষায় কথা বলেন। কর্ণাটকের মুত্তুরু, হাসহল্লি এবং মধ্যপ্রদেশের মোহদ ও ঝিরী। এছাড়া সংস্কৃত ভারতীর প্রয়াসে আরোও অনেক সংস্কৃত গ্রাম নির্মাণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

* সারা ভারতে প্রায় ৫০০০ এর অধিক সংস্কৃত পরিবার বর্তমানে বিদ্যমান যেখানে পরিবারের সকলেই সংস্কৃতভাষাকে ব্যবহারিক ভাষা রূপে প্রয়োগ করেন।

* বর্তমানে ভারতীয় সংসদে বহু সাংসদ সংস্কৃতভাষায় শপথ গ্রহণ করছেন শুধু নয় সংস্কৃতভাষায় বক্তব্য রাখছেন।

* ভারতের সংবিধান সংস্কৃতভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

* কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অসংখ্য সংস্কৃত সাহিত্যের পুস্তক ও সিডি এবং ডিভিডি প্রকাশিত হয়েছে।

* বর্তমানে বহু প্রতিষ্ঠান সংস্কৃত শিক্ষণের জন্য স্নাতক স্তর থেকে B Ed. M Ed প্রভৃতি শিক্ষণ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পঠন পাঠন চালু করেছে।

* আই আই টি এবং আই আই এম-এর মতো সংস্থায় সংস্কৃত শিক্ষা চালু হয়েছে।

* সংস্কৃত ফ্রন্টের জন্য কম্পিউটারে সফ্‌টওয়্যার তৈরি হয়েছে।

* 'সংস্কৃত গবেষণা সংস্থা' চালু হয়েছে কর্ণাটকের 'মেল কোট' নামক স্থানে। যেখানে সংস্কৃত কম্পিউটার নিয়ে বিশদ গবেষণা চলছে।

* রাষ্ট্রসঙ্ঘ 'World Heritage' ঘোষণা করেছে বেদের কয়েকটি ঋককে।

* লন্ডনের সেন্ট জেমস্ ইন্ডিপেনডেন্ট্ স্কুলে প্রথমশ্রেণী থেকে সংস্কৃত পড়ানো আবশ্যিক।

* দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানে সংস্কৃতভাষা স্থান পেয়েছে।

* আমেরিকার সংসদ ঋগ্বেদের মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে।

* ভারত সরকার শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনটি সংস্কৃত দিবস ও শ্রাবণী পূর্ণিমার তিনদিন আগে ও তিনদিন পরে সময়টি 'সংস্কৃত সপ্তাহ' হিসাবে ঘোষণা করেছে।

* বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে 'সংস্কৃত বিশ্বকোষ'।

* অনেক নাট্যসংস্থা সংস্কৃতভাষায় নাটক চালু করেছে।

* থাইল্যান্ডের রাজা, রানী, রাজকুমারী সংস্কৃতভাষায় কথা বলেন।

* বর্তমানে ভারত সরকারও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত সপ্তাহ পালনের আগ্রহ তৈরি করছে।

সংস্কৃতভাষা নিয়ে আজ সম্পূর্ণ বিশ্বে এক বিশাল আলোড়ন শুরু হয়েছে যা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি। শুরু হয়েছে এক মহাআন্দোলন। কারণ সংস্কৃত ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষার একমাত্র ভাষা। আমাদের প্রাণস্বরূপিণী ভাষা। আসুন, ভারতীয় সংস্কৃতি জাগরণে, সংস্কৃতভাষার প্রসারে ভারতমায়ের যোগ্য সুসন্তান হিসাবে সংস্কৃত ভাষা আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করি যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে। 'সংস্কৃত'ই হোক একমাত্র রাষ্ট্রভাষা— এই সংকল্প গ্রহণ করি। বদতু সংস্কৃতম্, জয়তু ভারতম্।

তথ্যসূত্র : দেবভাষা তরঙ্গিণী, ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার।

চিঠিপত্র

ত্রাণ নিয়ে রাজনীতি

তৃণমূল সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, বন্যা ত্রাণের বিলি- বণ্টন সরকারের মাধ্যমে হবে, অন্য কোনো রাজনৈতিক দল ত্রাণ-বণ্টন করতে পারবে না— এমনকী দু'একটি অনুমতিপ্রাপ্ত সেবা প্রতিষ্ঠান বাদে অন্যকোনো সংগঠনও হবে ত্রাণ বিলির অযোগ্য।

ইতিপূর্বে পীড়িতদের মধ্যে ত্রাণ-বণ্টনে এহেন অগণতান্ত্রিক বাধা-নিষেধ ছিল না। সেক্ষেত্রে সরকার পীড়িতদের সাহায্যার্থে জনগণ ও সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলির কাছে মুক্তহস্তে দান ও ত্রাণ-বণ্টনের আহ্বান জানাত। সেটাই ছিল রীতি। কিন্তু জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন তৃণমূল সরকার এবারই ত্রাণ-বণ্টন নিয়ে অভূতপূর্ব নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

সত্যি বলতে কী, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে তৃণমূল নেত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন পাখির চোখ। তাই জনবিরোধী সরকার ক্ষমতার লোভে যেন তেন প্রকারণে ক্ষমতা দখলের স্বার্থে ভোটে জিততে মরিয়া। সরকার ও শাসকদল চাইছে না, বিরোধীরা ত্রাণবিলি করে বন্যাপীড়িতদের সহানুভূতি আদায় করুক। পরবর্তীকালে তারা নির্বাচনী প্রচারে বলতে পারবে যে তারাই বন্যাপীড়িতদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, বিরোধীরা তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, অতএব জনগণ তাদেরকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন। দুর্গতরা নিশ্চয়ই এই বঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভুলবে না। ভোটবাক্সে এর প্রতিফলন ঘটাবে। তারা প্রমাণ করবে, 'চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না।'

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী নদীয়া।

'গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল'

গত ২১ জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে কলকাতার ধর্মতলায় যে সমাবেশ হয়ে গেল তাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য চলছে, এটা বরদাস্ত করা হবে না। শিক্ষক শিক্ষিকাকে সম্মান করতে হবে, তাঁদের দেখতে হবে।

প্রথমেই বলা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে অনিল মুখোপাধ্যায়ের নাম উনি একবারও উচ্চারণ করলেন না। এতবড় অকৃতজ্ঞ বোধহয় সচরাচর দেখা যায় না। ওই অনিলবাবু হাজরাতে ম্যাডামকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। যাইহোক, অকৃতজ্ঞরা চিরকালই একই রকম থাকে, তাদের চরিত্রের কোনো 'পরিবর্তন' হয় না।

ঘটনা হলো তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশে যা বলেছিলেন ঠিক তার দু'দিন পরে অর্থাৎ ২২ জুলাই তাঁর বক্তব্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে— (১) আসানসোলের রহমানিয়া স্কুলের শিক্ষককে চড় মারা হলো, (২) নদীয়ার বাদকুল্লার তাহেরপুরের অনসূয়া স্কুলের শিক্ষককে চড় মারা, (৩) মুর্শিদাবাদের কুলিতে কেজিএস স্কুলের শিক্ষককে মারধোর, (৪) পাণ্ডুয়ার সিমলাগড়ের উত্তরাখণ্ডের প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছুরি মারে সহ-শিক্ষককে। সুতরাং এর থেকে বোঝা যাচ্ছে 'অসারের তর্জনগর্জনই সার'। অর্থাৎ গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। শুধু পরিবারতন্ত্র করে চলেছেন।

এরপর যাকে 'ময়ূরসিংহাসনে' (!) বসাবার জন্য একান্তে তালিম দিয়ে চলেছেন সেই ব্যক্তি যদি সিংহাসনে বসেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের যে কী দুর্দশা হবে তা ভগবানই জানেন!

আবার সদর্পে তিনি বলেছেন, সিন্ডিকেট করলে গেট আউট। তাহলে বলি সিন্ডিকেট যদি না থাকে তো মাল আমদানি হবে কী করে? আর বাঘ যখন একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছে সে বাঘ মানুষখেকো হবেই। তাই যারা সিন্ডিকেট করে বাড়ি গাড়ি বৌ ছেলেমেয়ের খাওয়া পরার রাজকীয় যোগাড় করে চলেছে তারা বলবে চুলোয় যাক তৃণমূল। আর সর্বোপরি যারা সিন্ডিকেট করে তারা তো শাসকশ্রেণীর ক্ষমতায় বলীয়ান। শাসকশ্রেণীর শিক্ষামন্ত্রী সিন্ডিকেট যারা করে তাদের উৎসাহ দানের মতো কথা বলেছেন— "সিন্ডিকেটরাজ রাতারাতি বন্ধ করা যায় না।"

তৃণমূল যারা করে তারা যদি সিন্ডিকেট করে আর আপনি যদি তাদের গেট আউট করেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গ কালাহারি মরুভূমি হয়ে যাবে আর আপনি শুকনো খেজুর গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী, বর্ধমান।

'বাপকা বেটা'

স্বস্তিকা (১৩ জুলাই, ১৪) সংখ্যায় 'মনীষী কথা' লেখাটিতে লেখিকা ঠিকই বলেছেন, স্যার আশুতোষের অনেক গুণ শ্যামাপ্রসাদ পেয়েছিলেন, তাই লোকে তাঁকে 'বাপকা বেটা' বলত। তাঁর কথাটি বোধহয় প্রথম বলেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। স্যার আশুতোষের মৃত্যুর বছরখানেকের মধ্যে তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ৬.২.১৯২৫ তারিখের এক চিঠিতে লিখেছিলেন— "University'র সাধারণ কাজে তুমি দেখি 'বাপকা বেটা' হইয়াছ। কেননা এত অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কেউই করিতে রাজী নয়...।"

১৩ জুলাই-এর স্বস্তিকায় 'গূঢ়পুরুষ' বলেছেন, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৪ সালে হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন।' সঠিক তথ্য এই— শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি এবং বাংলার হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন।

(সূত্র : ড. অনিল চন্দ্র ব্যানার্জি-কৃত a phase in the life of Dr. Syamaprasad Mookerjee 1937-1946)।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

আত্মরক্ষা কতটা জরুরি

শ্রীমতী লক্ষ্মী দাস

সৃষ্টির পর থেকে মানুষ বন্যপশুদের থেকে নিজেদের নানা কৌশলে করে রক্ষা করে এসেছে। তখন বন্যপশুই ছিল মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী। হাতিয়ার হিসেবে কখনো পাথর, কখনো কাঠ আবার কখনো ধাতুর সাহায্যে পশুর মোকাবিলা করেছে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার যুগে মানুষকে মানুষের থেকে রক্ষা করতে হচ্ছে। এখানে জীবন রক্ষার চেয়েও মেয়েদের নিজের শালীনতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়িতে, রাস্তাঘাটে, অফিসে এমনকী স্কুলে পর্যন্ত কোনো নিরাপত্তা নেই। আর এটা যেন দিনে দিনে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে অশালীন আচরণ, ধর্ষণ এবং শেষে প্রাণনাশ। আজকাল ছোটবড় সকলেই ধর্ষণ, বলাৎকার, রেপ এই শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত। প্রতিদিন খবরের কাগজে বা টিভির খবরে চোখ রাখলে দেখা যাবে কত শত মেয়ের জীবন কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের আত্মরক্ষার বেশি দরকার আছে। কলেজে, হস্টেলে একটু সাদা-সিধে, সরল ছেলেমেয়ে দেখলেই তার ওপর র‍্যাগিং হয়। এই র‍্যাগিং-এর ফলে কত ছেলেমেয়ের প্রাণ পর্যন্ত চলে যায়। গ্রামগঞ্জ থেকে বুকে আশা নিয়ে আসা ছেলেমেয়েদের এইভাবে বলি হতে হয়।

এটা যে শুধু বর্তমানে হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। আগেও হোত। তবে আগে মানুষ এতটা প্রতিবাদী ছিল না। তারা প্রতিবাদ করতে ভয় পেত। কখনো বা মেয়ের বদনাম হয়ে যাওয়ার ভয়ে চুপচাপ অন্যায়কে মেনে নিত আবার কখনো বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্য। যার জন্য কেউ জানতে পারতো না। আর দোষী ব্যক্তিটিও শাস্তি তো পেতই না বরং মাথা উঁচু করে সমাজের বুকে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু বর্তমানে মানুষের চোখ খুলে গেছে, তারা জানে 'অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে' দু'জনেই সমান অপরাধী। তাই প্রতিবাদ হচ্ছে। সকলে জানতে পারছে। এখন মেয়েরা নিজেই থানায় গিয়ে পুলিশকে জানাচ্ছে। আবার এমন নজিরও আছে যেখানে পুলিশের কাছে এব্যাপারে সাহায্য চাইতে গিয়েও তাদেরকে পুলিশের লালসার শিকার হতে হয়েছে। তাই মানুষকে কখন কী পরিস্থিতিতে পড়তে হয়, তার জন্য আগে থেকে আত্মরক্ষার কিছু টিপস জানা ভীষণ জরুরি। রাস্তাঘাটে, স্কুলে-কলেজে, অফিসে নানান জায়গায় নানান রকমভাবে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

আমরা ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাই পড়াশোনা শেখার জন্য। সেখানে শিক্ষকদের কাছে আমাদের আশা, ভরসা এবং বিশ্বাস যে বাচ্ছারা ঠিকমত মানুষ হবে, সমাজের মুখ উজ্জ্বল করবে। তা না হয়ে কোনো কোনো শিক্ষকরা বাচ্চাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করছেন। ৩-৪ বছরের ছোটো ছোটো শিশুরাও শিকার হচ্ছে এই অত্যাচারের। বাচ্চাকে স্কুলে পাঠিয়েও আজ নিশ্চিন্তে থাকা যায় না। গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা দূরের স্কুলে পড়তে যেতে ভয় পায়, কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকার জন্য পায়ে হেঁটেই যাওয়া-আসা করতে হয়। পদে পদে বিপদ ওৎ পেতে থাকে। আবার বাড়িতে টিউশান পড়াতে এসেও সেখানে ছাত্রী শিক্ষকের লালসার শিকার হচ্ছে। কোথাও কি নিরাপদ আছে? শিক্ষিত, অশিক্ষিত কাউকেই আর বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং অপরাধ যেমনই হোক না কেন প্রতিবাদ করা উচিত। প্রতিবাদ করলে তবেই দোষীব্যক্তির শাস্তি হবে। প্রতিবাদ না করলে দোষীব্যক্তিটি পুনরায় অন্যায় করার সুযোগ পাবে।

আবার আমরা নিজেরাও অনেক সময় এর জন্য দায়ী থাকি। যেমন ছোটোবেলা থেকেই মেয়েদেরকে পোশাক-আশাক, চাল-চলনের ক্ষেত্রেও সচেতন করি না। তাদের বোঝাতে হবে যাতে শালীনতা বজায় থাকে। ছোটো থেকে যদি আমরা তাদের বোঝাই কী ধরনের পোশাক পরা উচিত, কিংবা কী ধরনের পোশাকে শালীনতা বজায় থাকে তাহলে তারা সেটা সহজেই বুঝতে পারবে। তবে আজকাল রাস্তাঘাটে এমনকী কলেজেও মেয়েরা এমন পোশাক পরছে যা দেখে লজ্জা হয়। পোশাক পরার মানে অপরকে আকৃষ্ট করা নয়, নিজের রুচিবোধকে তুলে ধরা। পোশাকের মাধ্যমে বোঝা যায় সে কী ধরনের পরিবেশ থেকে এসেছে। পোশাকের ব্যাপারে সচেতনতা রুচিশীলতার প্রমাণ।

এখন মোবাইলের যুগ। ট্রেনে, বাসে আপনার সামনের ব্যক্তিটি আপনার অলক্ষ্যে মোবাইলে আপনার ছবি তুলে কম্পিউটারের সাহায্যে নানারকম মোডিফাই করে খুব সহজেই আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে। তাই সেইখানেও আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। রাস্তাঘাটে চলাফেরা করার সময় চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হবে।

প্রতিবাদ হবে, দোষীর শাস্তিও হবে, কিন্তু ক্ষতির কোনো পরিমাপ হবে না। তাই ক্ষতি হবার আগেই আমাদের সচেতন হয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে। ধর্ষক ধরা পড়লে শাস্তি পায় কিন্তু একটি মেয়ের ধর্ষণের পর তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। স্কুলে-কলেজে কোথাও সে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না। কেউ তাকে বিয়ে করার কথা ভাবে না। ধর্ষিতার প্রতি ঘৃণা নয়, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাকে ধর্ষিতা ভাবার আগে মানুষ ভাবতে হবে। তাকে নতুন করে বাঁচতে দিতে হবে। স্কুলের পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্যারাটে, জুডো, মার্শাল আর্ট যদি শেখানো যায়, কিংবা দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের সংস্থা গড়ে ওঠে তবে সকলেই কমপক্ষে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাবে এবং বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সাহস পাবে। ■

রাখি—একাত্মতা জাগরণের প্রতীক

রাজদীপ মিশ্র

মহাকবি কালিদাস বলেছিলেন— ''উৎসবপ্রিয়াঃ খলু মনুষ্যাঃ''। উৎসবপ্রিয় মানুষ উৎসবের মাধ্যমে হৃদয়ের ভাব আদান প্রদান করে। উৎসবের মধ্য দিয়ে মানুষ দেশ-জাতি-ধর্মের কথা চিন্তা করে। ধর্মরক্ষার মাধ্যমে দেশকে শক্তিশালী ও অখণ্ড রাখার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

মানব সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতির মূলে যে সকল মানবিক ভাবনা আজও সক্রিয় তার অন্যতম হলো পরস্পরকে রক্ষা করার অঙ্গীকার। এই বোধ বর্তমান প্রজন্মকে সুরক্ষা দেয় ও শক্তিশালী করে। 'রাখি' শব্দটি এসেছে 'রক্ষা' থেকে। পরস্পরকে রক্ষা করার ভাবনা নিয়েই রাখিবন্ধন উৎসব। ব্যক্তি যেমন পরিবারকে রক্ষা করবে, ঠিক সেরকম সমাজও ব্যক্তি ও পরিবারকে রক্ষা করবে।

শ্রাবণী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হয়ে আসছে। হিন্দু জীবনে রাখির ভূমিকার কথা অপরিসীম। শিশুর জন্মের পর, তার নীরোগ সুস্থ জীবনের কামনায় মা বা মাতৃস্থানীয়রা যে লাল সুতার তাগা নবজাতকের হাতে বেঁধে দেন, তা রাখির মৌলিক ভাবনারই প্রতিফলন।

রাখিবন্ধনের ইতিহাস প্রাচীন বৈদিককালে বেদ-সংহিতায় গ্রন্থিবদ্ধ আছে—

''সদা বধ্নন্ দাক্ষনয়া হিরণ্যং শতানিকায় সুমন্যমানাঃ।
তন্ম অবধ্নামি শতশারদায়ায়ুষ্মান্ জরদষ্টির্যথাসম্''। (শুক্ল যজুর্বেদ)

অর্থ— দক্ষ বংশোৎপন্ন ব্রাহ্মণ পুরোহিত আমি রাজা শতানীকের মণিবন্ধে এই স্বর্ণিম রক্ষাসূত্র বন্ধন করছি, ফলশ্রুতিতে মহারাজ যেন আয়ুষ্মান্ শতসারদজীবী জরারহিত কলেবরে শোভন মনযুক্ত হন।

বর্তমানে রাখি বাঁধার সময় আমরা যে মন্ত্রটি উচ্চারণ করি, তা পৌরাণিক যুগের স্মারক। সত্যযুগের এই মন্ত্রটি হলো—

''যেন বদ্ধ বলিরাজা দানবেন্দ্র মহাবলঃ।
তেন ত্বাং অনুবধ্নামি রক্ষে মা চল চল।।''

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, সুশ্রুত, সংসূত্রসংস্থান, হরিভক্তিবিলাসে রাখিবন্ধনের উল্লেখ আছে।

তপোবনে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতাদেবী তাঁর দুই পুত্রের হাতে মন্ত্রপূত কুশের অগ্রভাগ (কুশ) ও নিম্নভাগ (লব) পরিয়ে দিয়ে রক্ষাবন্ধন করে তাদের নাম রাখেন কুশ ও লব। পুরাণে কথিত আছে, মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ কামনায় রক্ষাবন্ধন করেছিলেন। পৌরাণিক ঘটনার দেখা যায় দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্রাণী দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে রাখি বেঁধে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন। আলেকজান্ডারের সঙ্গে যুদ্ধের আগে রাজমহিষী পুরুর হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে পুরু স্বদেশ, স্বধর্মকে বিদেশি হানাদারদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। মধ্যযুগে চিতোরের রাণী কর্ণাবতী বাদশা হুমায়ুনের কাছে রাখি পাঠিয়েছিলেন। বাদশা কর্ণাবতীকে বোন বলে স্বীকার করে সুদূর বঙ্গদেশ থেকে চিতোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু বাদশা চিতোর পৌঁছনোর আগেই বাহাদুর শা-র আক্রমণে সম্মান রক্ষার জন্য রাণী জহরব্রতে প্রাণ বিসর্জন দেন। হুমায়ুন তাঁর রাখি-বোনকে রক্ষা করতে পারেননি। দক্ষিণ ভারতে এই দিন বিশেষ করে দেবতার উদ্দেশ্যে নারকেল উৎসর্গ করা হয়। উপকূলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায় তাদের জলযানকে রক্ষাসূত্রে বেঁধে ফেলেন। সেখানে এই তিথি 'নারিয়েল পূর্ণিমা' নামে খ্যাত। আজও সেখানে বিভিন্ন মঙ্গল অনুষ্ঠানে মঙ্গলসূত্র হাতে বেঁধে দেওয়া হয়।

এই রক্ষাবন্ধন প্রথা প্রাচীনকাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে হিন্দু সমাজে চলে আসছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা স্নেহের বন্ধনে সমাজে পরস্পরকে আবদ্ধ রাখার জন্য রক্ষাবন্ধন প্রচলন করেন। পারস্পরিক ভালোবাসা ও একাত্মতা প্রকাশের একটি আবেগঘন সামাজিক উৎসব রক্ষাবন্ধন। দেশের প্রয়োজনে, জাতির

প্রয়োজনে, সহস্রমন একসূত্রে গেঁথে, সহস্রজীবন উৎসর্গের শপথ নেবার উৎসব রাখিবন্ধন। ধর্মরক্ষা, সমাজরক্ষা, রাষ্ট্ররক্ষার অঙ্গীকারের উৎসব এই রাখিবন্ধন। পরস্পরকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি নিয়েই আমরা রাখি বাঁধি।

রাখিবন্ধনের মধ্যে উদ্দীপনাময় ঐক্যসূত্রের উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুভব করেছিলেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য যে আন্দোলন হচ্ছিল, তাকে তীব্রতর করার জন্য ১৬ অক্টোবর কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে বিশাল শোভাযাত্রার মাধ্যমে তিনি রাখিবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপন করেন। রচনা করেন বিখ্যাত গান—

"বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল।
পুণ্য হউক,পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।"

এই অকাল রাখিবন্ধন বাংলায় এনে দিয়েছিল এক নতুন উদ্যম, নতুন স্রোত, নতুন প্রতিরোধ। ফলস্বরূপ ১৯১১ সালে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। সেদিন রাখির রঙিন সুতো বেঁধে বাংলার জনসাধারণ পরস্পর দেশমাতৃকার অখণ্ডতা রক্ষার শপথ নিয়েছিল। ইংরেজদের 'Settled fact'কে 'Unsettled' করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। একজাতি-একপ্রাণ-একতার মন্ত্রে ভারতবাসী উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছিল। এই রাখি শুধু একটুকরো সুতোর বন্ধন নয়। এ হলো রাষ্ট্ররক্ষাসূত্র, সম্প্রীতিরক্ষাসূত্র, দেশের অখণ্ডতারক্ষার সূত্র। আমাদের অনৈক্য ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আমাদের মাতৃভূমি বারবার খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে। আমাদের দেশের যে যে অংশে হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে, বিভিন্ন চক্রান্তের কারণে, সেই অংশগুলি থেকেই দেশবিরোধী শক্তি ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশ বিরোধী, হিন্দু বিরোধী ওইসব চক্রান্ত রুখতে চাই সুদৃঢ় হিন্দু সংগঠন এবং হিন্দু ঐক্য।

আমাদের সঙ্কল্প করতে হবে, প্রকৃত প্রীতিভাবের অনুভূতি নিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরস্পরের প্রতি প্রকৃত বন্ধুভাবের উন্মেষ ঘটিয়ে পবিত্র একাত্ম জীবন সৃষ্টি করার। রাখি একাত্মতা জাগরণের প্রতীক। পরস্পর পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনের বাহক রাখি। যারা এই দেশকে কর্মভূমি, ধর্মভূমি, মোক্ষভূমি, পুণ্যভূমি মনে করে, দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের। ভারতকে বিশ্বের হিতের জন্য বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তাদের, ভারতকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের, ভারতকে বিভিন্ন চক্রান্তের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের, ভারতকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছানোর দায়িত্বও তাদের। রাখিবন্ধন উৎসব পারস্পরিক ঐক্যবোধকে সুদৃঢ় করে সেই পথকেই প্রসারিত করেছে যুগে যুগে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

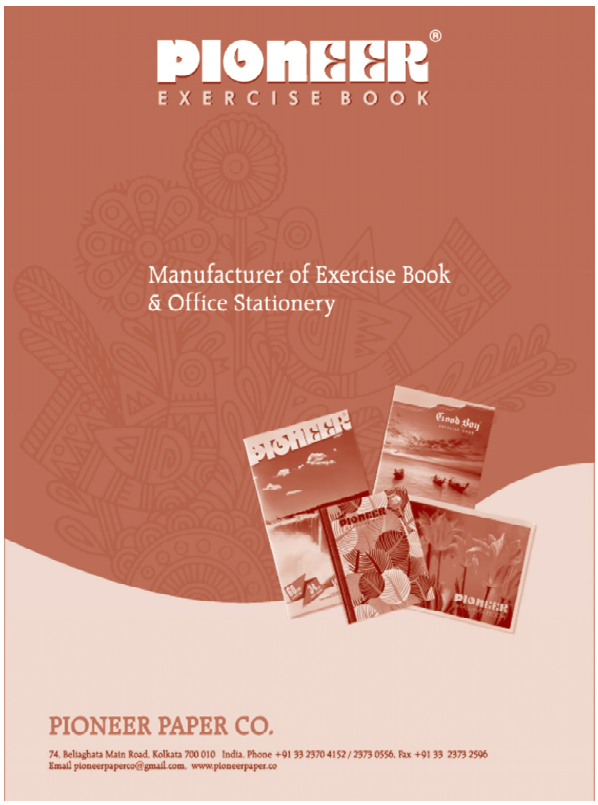

শ্রীচৈতন্যপরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

রাধাদামোদরের ‘পঞ্চরত্ন’ ও সতেরো চূড়া রাসমঞ্চ

ড. প্রণব রায়

পূর্ব-মেদিনীপুরের অন্তর্গত পাঁশকুড়া ঘাটাল পাকা রাস্তায় পাঁশকুড়া থেকে প্রায় নয় কিলোমিটার দূরে কেশাপাট। কেশাপাট থেকে পশ্চিমমুখী রাস্তায় গোঁসাইবেড় হয়ে কাঁসাই বাঁধ বরাবর অনেকটা যাওয়ার পর মাংলোই গ্রামে আসা যায়। কেশাপাট থেকে দূরত্ব প্রায় ৮ কিলোমিটার।

গ্রামে মাইতিদের রাধাদামোদরের ‘পঞ্চরত্ন’ ও ‘সতেরো চূড়া রাসমঞ্চ স্থাপত্য ও টেরাকোটা কাজের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুটি মন্দিরই ইঁটের তৈরি। রাধাদামোদর মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট। মন্দিরের সামনে ত্রিখিলান প্রবেশদ্বার। প্রবেশদ্বারের ওপরের তিন প্রস্থে এবং দু-পাশে প্রচুর ‘টেরাকোটা’ মূর্তি ও অলঙ্করণ আছে। ‘টেরাকোটা মূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনী, কমলে-কামিনী, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, বকাসুরবধ, হিড়িম্বাবধ, রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদের বিলাস, শিবদুর্গা, রাম-বারণের যুদ্ধ প্রভৃতি। কাঠের দরজার খোদাইকরা কাজে নক্‌শাছাড়া কোনো মূর্তি নেই। গর্ভগৃহের ভিতরের ছাদ ‘ভল্‌টে’ গঠিত। এই মন্দিরের দু-পাশে দুটি শিবের ‘সপ্তরথ’ দেউল আছে। কোনো কারুকার্য ও লিপি নেই। দুটির উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট।

টেরাকোটা-মূর্তির মধ্যে অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনী দুর্গার মূর্তিটি সুদৃশ্য। কবিকঙ্কণ বিরচিত সদাগর উপাখ্যানের প্রসিদ্ধ দৃশ্য কমলে-কামিনী এবং দুটি নৌযানে ধনপতি ও শ্রীপতি সদাগরের সিংহলযাত্রাদৃশ্য এখানে সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। এছাড়া আরো দুটি প্রস্থে বহু টেরাকোটা ফলক আছে।

মন্দিরে প্রতিষ্ঠাকাল জ্ঞাপক কোনো লিপি না থাকলেও স্থাপত্য ও টেরাকোটা অলঙ্করণ দৃষ্টে এটি রাধাদামোদরের রাসমঞ্চের (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ) কিছু পূর্ববর্তী মনে হয়।

রাধাদামোদরের ‘সপ্তদশরত্ন’ রাসমঞ্চের দ্বিতলে আটটি ও ত্রিতলে নয়টি চূড়ার মধ্যে কয়েকটি ভগ্ন। চূড়াগুলি সমান্তরাল খাঁজকাটা। উচ্চতা প্রায় ২৫ ফুট। দক্ষিণদিকের দেওয়ালে প্রতিষ্ঠাকালের পোড়ামাটির লিপিটি যথাযথভাবে উদ্ধার করা হলো :

‘শ্রীশ্রীরাধাদামুদর জীউ
শুভমস্তু সকাব্দা,
১৭৮০ সক সন ১২
৬৬ সাল ইঙ্গরাজী
সন ১৮৫৯ সাল
শ্রীঠাকুরদাস মাইতি’

লিপিতে শকাব্দ ও বঙ্গাব্দ ছাড়াও ইংরাজি সালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরূপ ইংরাজি সালের উল্লেখ মন্দিরলিপিতে নেই বললেই চলে। আমার দেখা দু-তিনটি মন্দিরে ইংরাজি সালের উল্লেখ আছে।

রাসমঞ্চটির নিচের তলে প্রবেশপথের ওপরে আটটি প্রস্থে পোড়া মাটির প্রচুর মূর্তি বিস্ময় সৃষ্টি করে। মূর্তিগুলির মধ্যে গোপীদের বস্ত্রহরণ, বালকৃষ্ণের ননিচুরি, মস্তকে দধিভাণ্ড-সহ গোপীদের নৌকায় গমন, রামসীতার রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি। কার্নিশের নিচে কয়েকটি বড়ো ‘টেরাকোটা’-ফলকে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের বিলাসদৃশ্য আছে। রামায়ণ কাহিনির মধ্যে সীতাহরণ, জটায়ুকর্তৃক রাবণের রথ আক্রমণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ ও বানরসেনার মূর্তি আছে। এছাড়া ঋষিগণ কর্তৃক মহামায়া দশভুজার স্তব, দেবীর আবির্ভাব, ধেনুকাসুরবধ ইত্যাদি দৃশ্যও আছে।

রাসমঞ্চটির টেরাকোটা নিম্নমানের না হলেও খৃষ্টীয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের নির্মাণ শৈলীর পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। রাধাদামোদরের টেরাকোটাগুলি এই নির্মাণশৈলীর। দূরবর্তী এইরূপ একটি গ্রামে এ ধরনের মন্দির ও রাসমঞ্চ বিরল। ■

‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

রেবতী

রৈবত রাজার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। তার নাম রেবতী। রেবতী শুধু সুন্দরীই ছিল না অনেক গুণে গুণবতী ছিল। রাজা রৈবতের চিন্তা যে তার এমন সুন্দরী গুণবতী কন্যার জন্য পাত্র কোথায় পাওয়া যায়। বহু চেষ্টাতে যখন কয়েকজন রাজার খোঁজ পাওয়া গেল তখন আর এক মুশকিল দেখা দিল। মহারাজ রৈবত কিছুতেই ঠিক করতে পারলেন না যে এঁদের মধ্যে কোন রাজা তাঁর কন্যার উপযুক্ত বর। রৈবত তখন মন্ত্রী ও সভাসদদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে তিনি ব্রহ্মলোকে যাবেন প্রজাপতি ব্রহ্মার উপদেশ নিতে। সঙ্গে কন্যা রেবতীকেও নিয়ে যাবেন।

তারপর একদিন রাজা রৈবত তাঁর কন্যাকে নিয়ে ব্রহ্মলোকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন সঙ্গীতসভা বসেছে। সেকি চমৎকার গান। পৃথিবীতে এমন গান শোনা যায় না। রাজা আর রাজকন্যা ব্রহ্মার সভায় বসে তন্ময় হয়ে সেই গান শুনতে লাগলেন। এক সময় সঙ্গীত-সভা শেষ হলো। রাজা তখন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললেন, 'ভগবান, আমার কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র কীভাবে নির্বাচন করব আপনি বলে দিন।'

ব্রহ্মা বললেন, 'তুমি তোমার কন্যার বিয়ের জন্য কোন কোন রাজার খোঁজ পেয়েছিলে?'

রাজা রৈবত যেসব রাজার খোঁজ পেয়েছিলেন তাঁদের বর্ণনা দিয়ে বললেন—'প্রভু আমি এই সকল রাজার সন্ধান পেয়েছি। এখন আপনি ঠিক করে দিন এঁদের মধ্যে কে আমার কন্যার উপযুক্ত'।

ব্রহ্মা রাজার কথা শুনে হাসতে লাগলেন, তারপর বললেন 'এই যে সব রাজার নাম তুমি করলে তারা কেউই আর জীবিত নেই। এমনকী এদের পুত্র পৌত্ররাও পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছে।'

রৈবত অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি প্রভু। এই তো সবে তাঁদের সন্ধান পেলাম!'

ব্রহ্মা বললেন, 'ব্রহ্মলোকের এক মুহূর্ত সমান মর্ত্যলোকের অনেক বছর। তাই যতটুকু সময় তোমরা এখানে আছো সেই সময়ের মধ্যে মর্তে বহু যুগ পার হয়ে গেছে। শুধু তুমি আর তোমার কন্যা ব্রহ্মলোকে থাকার জন্য তোমাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তোমরা এখন মর্তে ফিরে যাও।'

রাজা বললেন, 'প্রভু, তাহলে তো আমার কন্যার আর বিয়েই হবে না। এখন আমি কী করব আপনিই বলে দিন।'

ব্রহ্মা বললেন, 'তোমার কন্যা অশেষ গুণবতী ও সুলক্ষণা। তার যোগ্য পাত্র শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই বলরাম। তুমি দ্বারকায় গিয়ে বলরামের সঙ্গে তোমার কন্যার বিয়ে দাও। আর জেনে রেখো, এটাই তোমার কন্যার বিধিলিপি।'

রাজা রৈবত তখন কন্যা রেবতীকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন তাঁর রাজধানী প্রাসাদ কিছুই আর নেই। যে রাজা রাজত্ব করছে সে তাঁদের চিনতে পারলেন না। কী করে চিনবে, মাঝখানে তো বহু যুগ পার হয়ে গেছে। এই রাজা তাঁর বংশের অনেক পুরুষ পরের একজন, সে রৈবতের নামই শোনেনি।

—তখন তিনি আর কী করেন, কন্যাকে নিয়ে দ্বারকায় বলরামের কাছে উপস্থিত হলেন।

বলরাম সকল বৃত্তান্ত শুনে ও বেরতীকে দেখে বিয়ে করতে রাজি হলেন। আর রাজা রৈবত বলরামের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে নিশ্চিন্ত মনে বনে চলে গেলেন তপস্যা করতে।

প্রশান্ত সেন

মনীষী কথা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় চিত্রকলার উৎকর্ষতাকে এক অনন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন। অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্র ও ভাস্কর্যকে তিনি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির উজ্জ্বল নক্ষত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বলতে হয়। তাঁর জন্ম ১৮৭১ সালের ১ আগস্ট। বাবা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৮৯ সালে পড়াশুনা শেষ করে তিনি শিল্পচর্চায় মন দেন। বহু খ্যাতিমান চিত্রশিল্পীর কাছে ছবি আঁকা শেখেন। তারপর জাপান, ইংল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্স বহু দেশে তার চিত্রপ্রদর্শনী হতে থাকে। পান বহু সম্মান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। তিন বছর তিনি বিশ্বভারতীর আচার্যপদ অলঙ্কৃত করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক গদ্য রচনা করেছেন। ক্ষীরের পুতুল, বুড়ো আংলো, রাজকাহিনী, নালক প্রভৃতি তার অসাধারণ সাহিত্য কীর্তি। ১৯৫১ সালের ৫ ডিসেম্বর এই এই মহানশিল্পীর প্রয়াণ ঘটে।

প্রশ্নবাণ

১.ছৌ-নাচ পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলার লোকনৃত্য?

২.বীরভূমের প্রধান লোকসঙ্গীত কী?

৩.জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত কী?

৪.গম্ভীরা কোন্ জেলার লোকসঙ্গীত?

৫.জয়দেবের মেলা কোন্ জেলায়?

উত্তর : ১. পুরুলিয়া। ২. বাউল। ৩. ভাওয়াইয়া। ৪. মালদা। ৫. বীরভূম।

ছবিতে অমিল খোঁজ

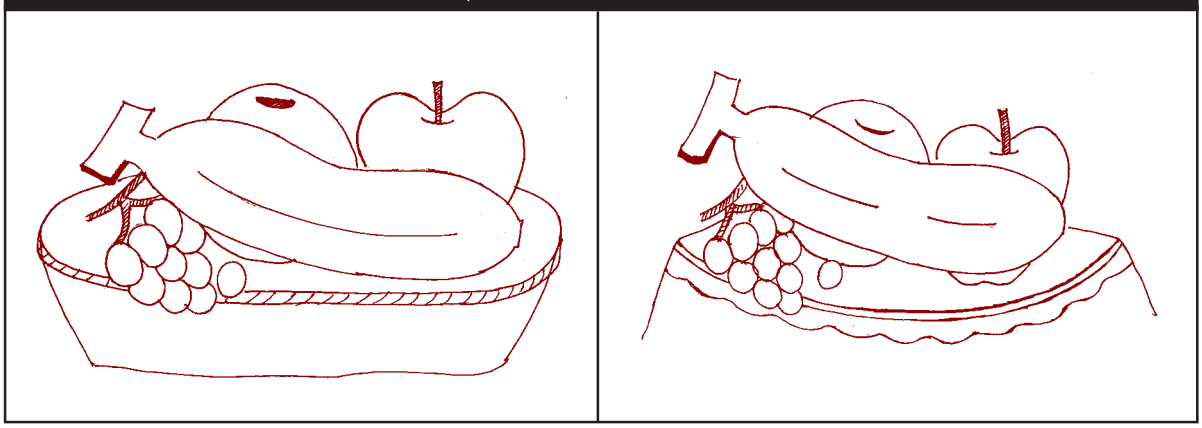

ছোটদের কলমে

বর্ষা

শিবম মাজী, বাঁকুড়া, ষষ্ঠ শ্রেণী

তুমি আসবে কখন—
এই আশাতেই বুক বেঁধেছি যখন
মেঘ গুড়গুড় শব্দে তুমি
জানান দিলে তখন।

সবাই অবাক, মেঘ উঠেছে আকাশ জুড়ে
বর্ষা এবার হবে,
নরম হবে চাষের মাটি
চাষিরা চাষ করবে।

বর্ষা এলো ব্যঙেরা সব
ডাকছে গ্যাঙর গ্যাঙ্
তারাও যেন চাইছে সবাই
মাঠ ঘাট সব হোক না সবুজ রঙ।

ছোট্ট ছেলে আনন্দেতে
ঝাঁপিয়ে পড়ে পুকুর জলে
সেদিকে নেই খেয়াল কারো
আপন মনে মাঠেই চলে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

চাই মানসিকতার পরিবর্তন

শবরী ঘোষ

শিক্ষা থেকে শুরু করে রাজনীতি, সেনাবাহিনী, মহাকাশ অভিযান অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় মেয়েদের অবাধ পদচারণা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনো আমাদের সমাজে বহু মানুষ মেয়েদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে গণ্য করেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী পূজিত হন মাতৃশক্তিরূপে। কিন্তু 'মেয়েরা মায়ের জাত' এবং 'মেয়েদের কাজ হলো কেবলমাত্র বংশরক্ষার জন্য সন্তানের জন্ম দেওয়া ও তাদের মানুষ করা'— এই দুটি ধারণা নিশ্চয়ই এক নয়।

অশিক্ষিত পরিবারগুলির একটি বৃহৎ অংশ মেয়েদের সন্তানের জন্ম দেওয়ার মেশিন মাত্র মনে করে। আমার সহকর্মী বিজ্ঞানের এক অধ্যাপক সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, 'মেয়েদের জন্ম হয়েছে তো এই জন্যই যাতে তারা ভবিষ্যতে সন্তানের জন্ম দিয়ে বংশবিস্তারে আমাদের সহায়তা করতে পারে।' অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করেছিলাম শুনে যে, তিরিশের কোঠায় না পৌঁছনো ওই সহকর্মীর তথাকথিত শিক্ষিত মা-ও ছেলের এই চিন্তাভাবনাকে সমর্থন করেন। মেয়েরা নিজেরাই যদি এধরনের ধ্যানধারণা পোষণ করে তবে ছেলেদের আমরা কী দোষ দেব?

এখনো অনেক পরিবারে কন্যাসন্তান অবাঞ্ছিত। কন্যাভ্রূণ হত্যার পরিসংখ্যান দিনে দিনে যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, ভারতে প্রতি ১০০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা মাত্র ৯৪০ জন। ভারতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় সাড়ে তিন কোটি কম। এই হার বজায় থাকলে আগামী ১৫ বছর পরে অন্তত দু'কোটি ভারতীয় পুরুষ বিবাহ করার জন্য মেয়ে খুঁজে পাবেন না। আর কন্যাসন্তান না থাকলে ভবিষ্যতে 'মাতৃত্ব' শব্দটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।

অনেক পরিবারেই পুত্র ও কন্যাসন্তানের মধ্যে তীব্র ভেদাভেদ করা হয়। পুষ্টিকর খাদ্য বরাদ্দ হয় পুত্রসন্তানটির জন্য আর বাড়ির পুরুষদের সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে অবশিষ্ট পড়ে থাকা খাদ্য জোটে মেয়েদের ভাগ্যে। আমি নিজে দেখেছি যে, বহু ক্ষেত্রে মায়েরা নিজেরাই পুত্র ও কন্যার মধ্যে তফাত করেন। পুত্রের উচ্চশিক্ষা নিয়ে চিন্তিত বহু মা'কে বলতে শুনেছি যে, 'মেয়ের লেখাপড়া নিয়ে অত বেশি ভাবি না। ওর বিয়েটাই কেবল চিন্তার বিষয়।' অনেক মেধাবী বান্ধবীর উচ্চশিক্ষা লাভ করার স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেছে এই জন্য যে, তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকারা মনে করতেন যে, 'যে মেয়ে ভবিষ্যতে পরের ঘরে চলে যাবে তার জন্য ফালতু খরচ করা কী দরকার। বরং ছেলে ঘরে থাকবে, ভবিষ্যতে আমাদের দেখবে তার পড়াশোনার জন্যই টাকা ঢালা উচিত।'

সংসার প্রতিপালনের জন্য অথবা নিজের ইচ্ছা পূরণ করতে অনেক মেয়েই চাকুরি করেন। কোনো কারণে কর্মক্ষেত্রে থেকে বাড়ি ফিরতে যদি মেয়েটির দেরি হয়, তখন পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের তির্যক চাহনি ও কটু মন্তব্য তাদের সহ্য করতে হয়। সবথেকে অবাক লাগে, ওই মেয়েটির চরিত্র সম্পর্কে যাঁরা এধরনের মন্তব্য করছেন তাদের সিংহভাগই আবার মহিলা। আমার পরিচিত এক অধ্যাপকের মা একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'আমার ছেলের কর্মরতা মেয়ে ছাড়া বিয়েই দেব না। তবে যে-সে চাকুরি হলে চলবে না। স্কুলটিচার বা কলেজের প্রফেসরই চাই। অন্য চাকুরি করতে গেলে মেয়েদের চরিত্র ঠিক থাকে না।'

যেখানে ভারত বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলে একজন খেলোয়াড়ের বান্ধবীকে দায়ী করা হয় এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁর সম্পর্কে অপভাষার ঝড় তোলে সেই দেশে মেয়েদের উন্নতি কীভাবে হবে? মেয়েদের উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং তাদের সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। সবার আগে মেয়েদের উচিত নিজেদের নারী হিসাবে সম্মান করতে শেখা। তারা যদি নিজেদের কেবলমাত্র সংসারের বিনা মাইনের দাসী বা সন্তানের জন্মদাত্রী মেশিন মনে করার পরিবর্তে সংসার ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ নাগরিক বলে মনে করে তাহলে পুরুষদের মানসিকতাতেও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। কেউ যদি নিজেকে সম্মান করতে না শেখে তবে সে অন্যের কাছ থেকে সম্মান লাভ করবে কী করে? পোশাক-আশাক বা ভাষাবিপ্লবের চেয়েও মানসিকতায় যদি পরিবর্তন আনা যায় সেটাই কিন্তু হবে প্রকৃত বিপ্লব। ▌

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

প্রতিকপি ১০ টাকা

গঙ্গা ভারতের আর্থিক রাজধানী

অতিথি কলম

তরুণ বিজয়

গঙ্গা ও ভারতবর্ষ মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। যদি সিন্ধুনদের কারণে আমাদের পরিচয় হিন্দু হয়, দেশের নাম ইন্ডিয়া বা হিন্দুস্থান হয়, সেই রকম গঙ্গার কারণে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় সারা দুনিয়াতে মান্যতা পায়। কথায় বলে— 'আমি সেই দেশের অধিবাসী যেখানে গঙ্গা প্রবাহিত হয়।' গঙ্গা আমাদের মা, আমরা তাঁর সন্তান। সমস্ত জলই গঙ্গাজল ও সমস্ত নদীই গঙ্গার প্রতিচ্ছবি। জন্ম ও মৃত্যু উভয় সময় মানুষের মুখে দু' ফোঁটা গঙ্গাজল পড়ে গেলে মনুষ্যজীবন ধন্য মনে করা হয়। আজও মানুষের ঘরে ঘরে ২০/৫০ বছরের পুরনো গঙ্গাজল রাখা থাকে। স্নান, পূজা ও অন্যান্য শুভ কাজ আরম্ভ করার সময় বিভিন্ন নদীর নাম মন্ত্রের মাধ্যমে আবাহন করা হয়,তাতে গঙ্গার নাম প্রথমেই আসে (গঙ্গে চ যমুনে চৈব...)। ভারতবাসী বিদেশে যেখানেই গেছে সেখানেই গঙ্গানদী বা গঙ্গাজলের প্রসঙ্গ রেখেছে। যে কোনো জায়গায় হিন্দুর গঙ্গাজলের স্পর্শ চাই।

মরিশাসে 'কোটলুই' নামক স্থানে একটি বড় জলাশয়ের নাম 'গঙ্গা পুকুর' রাখা হয়েছে, ভারতে গঙ্গার তীরে যেমন ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করা হয়, মরিশাসেও ওইসব হিন্দুরীতি গঙ্গাপুকুরের ঘাটে হয়ে থাকে। সুরিনামের রাজধানী 'পারামারিবু'তে সবচেয়ে বড় নদীর পাড়ে 'গঙ্গাঘাট' বানানো হয়েছে। এই রকমই কোনো না কোনো ভগীরথ যেখানেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে গঙ্গাকে আবাহন করেন সেখানেই মা-গঙ্গা অবতরণ করেন। সন্ত রবিদাস পেশাতে চর্মকার ছিলেন, কিন্তু চামড়া ধোওয়ার ছোট পাত্রের জলে ভক্তির দ্বারা গঙ্গা দর্শন করেছিলেন। প্রবাদ হয়েছে— 'মন চাঙ্গা তো, কটোরী মেঁ গঙ্গা'।

মা গঙ্গার সবচেয়ে সুন্দর স্তুতি আদি শংকরাচার্য রচিত গঙ্গাষ্টকম্। এর প্রতিটি লাইন অদ্ভুত, প্রেরণাদায়ী, হৃদয় স্পন্দনকারী। গঙ্গাকে দেবী সুরেশ্বরী, ভগবতী, ত্রিভুবনতারিণী বলা হয়েছে। এই গঙ্গা উত্তরাখণ্ডের গোমুখ হতে উৎপন্ন হয়ে আড়াই হাজার কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে গঙ্গাসাগরে পতিত হয়েছে। স্বামী প্রণবানন্দজীর মত অনুসারে গঙ্গার উৎস কৈলাস-মানস সরোবর। তাঁর মানস সরোবর যাত্রার সময় অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে একথা প্রমাণ করেছেন। ভগীরথ ৬০ হাজার পূর্বপুরুষকে মুক্তির জন্য গোমুখে ভগবান শিবের তপস্যা করে গঙ্গার ধারাকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন।

এই জন্য গোমুখ থেকে যে গঙ্গা বেরিয়েছে তাকে ভাগীরথী বলা হয়। দেবপ্রয়াগে যখন ওই ধারা অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন গঙ্গা নাম ধারণ করে। গোমুখ হিমালয়ের ১২৭৭০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। ওই স্থানে আদিকাল থেকে হাজার হাজার ভক্ত অনেক কষ্ট সহ্য করে গঙ্গাস্তুতি করার জন্য যান এবং হাড় কাঁপানো বরফগলা জলে স্নান করেন। এরপর এই ধারার সঙ্গে ধৌলীগঙ্গা, পিণ্ডর, মন্দাকিনী ও অলকানন্দা মিলিত হয়। তেহরির নিকট ভাগীরথীতে বিরাট বাঁধ দেওয়া হয়েছে। যে কারণে সমতল ভূমিতে গরমের সময় গঙ্গার জলকে প্রয়োজনমতো ছাড়া হয়। যে গঙ্গা গাড়োয়াল অঞ্চলে হাজার হাজার বছর ধরে অবারিত ধারাতে বয়ে আসছিল তা সভ্য ও বিকাশশীল রাজনীতির খেলায় তাকে একটি জলাশয়ে পরিণত করা হয়েছে। গঙ্গার ধারাকে অবরুদ্ধ করে তেহরির জলাধার দেখে এমনই মনে হয়। এই অবরুদ্ধ জলরাশিকে দেখে মনে ভয় ও কাঁপুনি জাগে। এখন তো প্রতি ১০/১৫ কিলোমিটার অন্তর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে। পাহাড় থেকে জঙ্গলে ভ্রষ্টাচার ও ধনলোলুপতার কারণে পাহাড়ে ধস, বার বার বন্যা ও দুর্ঘটনা সৃষ্টি করছে। দু'বছর পূর্বে কেদারনাথ বিপর্যয়ে ৭ হাজার লোক মারা গেছে। এই প্রথম গঙ্গাজলকে সুড়ঙ্গ কেটে প্রবাহিত করিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং লোকেরা গঙ্গার শুষ্কতল দেখেছে। এটাও আমাদেরই কীর্তি!

পরবর্তী পর্যায়ে কনৌজের পাশে অবস্থিত রামগঙ্গার বিশাল প্রবাহ গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রয়াগে যমুনা ও অদৃশ্য সরস্বতী মিলিত হয়ে ত্রিবেণী তীর্থ সৃষ্টি করেছে। অতঃপর পশ্চিমবাংলার মালদা পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার পথে অনেক নদী ও জলপ্রবাহ গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। ফরাক্কাতে গঙ্গার উপর বাঁধ

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street,
Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

দিয়ে জলকে নিয়ন্ত্রিত করে কিছু জল হুগলীনদী দিয়ে প্রবাহিত করা হচ্ছে, বাকি পদ্মা নাম নিয়ে বাংলাদেশে বয়ে যাচ্ছে। হুগলীনদীকে গঙ্গা বা ভাগীরথী হিসাবে দেখা হয়। ভাগীরথী কলকাতা থেকে ১৫০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে গঙ্গাসাগরে মিলিত হয়েছে এবং পদ্মার প্রবাহ বাংলাদেশের দিকে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরের পড়েছে।

ভারতের মধ্যে গঙ্গাজল প্রবাহী ক্ষেত্র সবচেয়ে দীর্ঘ ও বিস্তৃত, তা সম্পূর্ণ ভূক্ষেত্রের ২৬ শতাংশ। এই ক্ষেত্র ভারতের জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ লোকের উপকার করে এবং নেপাল ও বাংলাদেশ পর্যন্ত স্পর্শ করে। গঙ্গাক্ষেত্র ভারতের ১১টি রাজ্যকে প্রভাবিত করে— উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ।

বর্তমানে ভক্তদের কারণেই গঙ্গা দূষিত হচ্ছে এবং আচমন ও স্নানের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। গঙ্গোত্রী থেকেই সমগ্র যাত্রাপথে নোংরা ফেলা শুরু করে হুগলী পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানার বর্জ্য ও নোংরা জল গঙ্গায় ফেলা হচ্ছে। গঙ্গাকে দূষিত করার জন্য কোনো তুর্কি, মঙ্গোলীয়, আরবিরা আসছে না, বরং যারা গঙ্গাস্নানে মুক্তির আশা করে তারাই গঙ্গাকে নষ্ট করছে। উত্তরাখণ্ডে কমপক্ষে ২৪টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গঙ্গার উপর তৈরি হয়েছে যা বিপদের কারণ। হরিদ্বারে মেলা ও অন্যান্য কারণে জলে এত নোংরা মিশছে যে হর কী পৌড়ীতে গঙ্গাজলে দূষণের পরিমাণ ১০০০ এমপিএন প্রতি ১০০ মিলিলিটার থেকে ৪০০.৬ লক্ষ এম পি এন প্রতি ১০০ মিলিলিটার পাওয়া গেছে অর্থাৎ পরিস্থিতি এমনই যে, কেউ হরকী পৌড়ীতে স্নান করলে শরীর অসুস্থ হয়ে যাবে। সেই রকমই হুগলী নদীতে দক্ষিণেশ্বরে (কলকাতা) দূষণের মাত্রা ৫০০০০ এমপিএন/১০০ মিলিলিটার। দক্ষিণেশ্বরে লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গাস্নান করে। এখানেই সেই বিখ্যাত কালীমন্দির যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সাধনা করছেন। উল্লেখযোগ্য এই যে গঙ্গাজলে প্রদূষণের মাত্রায় ১১০,০০০ এমপিএন প্রতি ১০০ লিটারে পাওয়া গেছে, যেখানে স্নানের জলে শুদ্ধতার মাত্রা ৫০০ এমপিএন/১০০ মিলিলিটার নির্ধারিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কী সম্ভব যে গঙ্গার তীরে শবদাহ সংস্কার করার পদ্ধতি বদল করা যায় এবং ভক্তগণ প্রিয়জনের শবদাহে গঙ্গাজল ছিটিয়ে অন্য জায়গায় সংস্কার করবেন অথবা বিদ্যুৎচুল্লী ব্যবহার করা বা কমপক্ষে চিতাভস্ম গঙ্গাতে না ফেলা। গঙ্গাতে প্রতিমা বিসর্জনও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নমামি গঙ্গে পরিকল্পনার শুভারম্ভ করেছেন তা খুবই আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ। এই প্রথম ভারত সরকার সুশ্রী উমা ভারতীর নেতৃত্বে গঙ্গার স্বচ্ছতার জন্য আলাদা মন্ত্রক গঠন করেছে। কেন্দ্রীয় নৌ-পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গড়করি ২০১৫ সালের মে মাসে 'জাতীয় জলপথ বিধি ২০১৫' ঘোষণা করে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কারণ গঙ্গার জলের স্তর বাড়িয়ে যদি জল পরিবহণ বাড়ানো যায় তাহলে গঙ্গার অতীত বৈভব ফিরে আসবে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, হলদিয়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত গঙ্গার ১৬৩০ কিলোমিটার প্রবাহকে 'প্রথম জাতীয় জলপথ' বলা হচ্ছে। এই অংশ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও পূর্ব উত্তর প্রদেশের সেই অঞ্চলের অন্তর্গত যেখানে গরিব লোকেরা বাস করে এবং যারা পরিকাঠামোগত সুবিধা পায় না। গঙ্গাজলপথ এই অঞ্চলের অর্থব্যবস্থা বদল করে বারাণসীতে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে মিলিত হতে পারে, যার দ্বারা মাল পরিবহণের এক নতুন অধ্যায় সূচনা হতে পারে। শুধু তাই নয়, ব্রহ্মপুত্রের দ্বিতীয় জাতীয় জলপথের সঙ্গে প্রথম জলপথ জুড়ে পূর্বোত্তর ভারতের সমৃদ্ধি আনতে পারে। এই জলপথের পুনরুত্থান রেল পরিবহণের ১/৩ অংশ ভার কম করবে।

গঙ্গাজল ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। একবার যদি গঙ্গার স্বচ্ছতা ও জলপ্রবাহের শক্তি ফিরে আসে তাহলে ভারত সমৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। বস্তুত গঙ্গা হলো ভারতের আর্থিক রাজধানী। তাই গঙ্গার উপকারিতাকে স্বীকার করলে নবীন ভারতের অভ্যুদয় সম্ভব হবে। ■

আগুনের ডানা নিয়ে এক বিজ্ঞানী

শুভদীপ পাল

একবার কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্ট চলাকালীন ৭০ জন বৈজ্ঞানিকের একটি দল তাঁদের প্রোজেক্ট ম্যানেজারের অধীনে কাজ করছিলেন। একদিন সেই দলের একজন বিজ্ঞানী প্রোজেক্ট ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় ছুটি নেওয়ার আর্জি জানান, কারণ তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের একটি প্রদর্শনীতে নিয়ে যাবেন বলে কথা দিয়েছিন। প্রোজেক্ট ম্যানেজার তাঁর ছুটি মঞ্জুর করেন। যাইহোক, সেই বিজ্ঞানী এরপর তাঁর কাজে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েন যে কাজ শেষ করে ঘড়িতে তাকিয়ে দেখেন সন্ধ্যা সাড়ে আটটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি তিনি ম্যানেজারের কাছে ছুটি চাইতে গিয়ে দেখেন তিনি সেখানে নেই। তিনি আর অপেক্ষা না করে বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন এই ভাবতে ভাবতে যে ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই তাদের বাবার উপর খুব রেগে গিয়ে থাকবে। বাড়ি পৌঁছে তিনি দেখেন তারা বাড়িতে নেই। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে স্ত্রী বলেন, ''তুমি জানো না? তোমার ম্যানেজারবাবু তো সওয়া পাঁচটায় এসে ওদের প্রদর্শনীতে নিয়ে গেছেন।''

এই মহানুভব ম্যানেজার বাবুটি আর কেউ নন, আমাদের অতিপ্রিয়, দেশের একাদশতম রাষ্ট্রপতি, 'ভারতের মিসাইলম্যান' নামে পরিচিত ড. আবুল পাকির জয়নুল আবেদিন আবদুল কালাম। ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর তাঁর জন্ম তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে মসজিদ গলিতে। বাবা জয়নুল আবেদিন ছিলেন মাঝি। তিনি রামেশ্বরম ও ধনুষ্কোডির মধ্যে যাতায়াতকারী হিন্দু পুণ্যার্থীদের ফেরিতে পারাপার করতেন। মা আসিয়াম্মা ছিলেন গৃহিণী। অত্যন্ত গরিব এই সংসারে সাত ভাইবোনের সঙ্গে মানুষ হচ্ছিলেন তিনি। রামনাথপুরম সোয়ার্ৎজ ম্যাট্রিকুলেশন স্কুল থেকে পাশ করার পরই তিনি সংবাদপত্র বিলি করার কাজে নামেন, সংসারে কিছু আর্থিক সাহায্য করার জন্য। কিন্তু প্রবল আর্থিক কষ্টের মধ্যেও তিনি নিজেকে মেধাবী ছাত্র বলে প্রমাণ করেন। দিনের বেশিরভাগ সময় তিনি পড়াশোনাতে ব্যয় করতেন, বিশেষভাবে গণিতে। ১৯৫৪ সালে তিরুচিরাপল্লীর সেন্ট জোসেফ কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হওয়ার পর তিনি মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে এয়ারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ভর্তি হন। একবার সেখানে একটি সিনিয়র ক্লাস প্রোজেক্টে কাজ করার সময় কলেজের ডিন তাঁর কাজের খুব কম অগ্রগতি দেখে রেগে যান এবং ভয় দেখান যে তিনদিনের মধ্যে প্রোজেক্ট শেষ না করতে পারলে তাঁর বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে। কালাম তিন দিনের মধ্যেই প্রোজেক্ট সম্পূর্ণ করে ডিনকে জমা দিয়ে আশ্চর্যান্বিত করে দেন। পরে ডিন তাঁকে বলেছিলেন, ''আমি তোমাকে একটি কঠিন সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তোমাকে চাপে ফেলে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম, আর তুমি তাতে উত্তীর্ণ হয়েছে।'' কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও ফাইটার পাইলট হওয়ার তাঁর স্বপ্ন অল্পের জন্য পূরণ হয়নি, কারণ আই এ এফ পরীক্ষায় তিনি নবম হন, যেখানে আসন ছিল মাত্র আটটি।

১৯৬০ সালে মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে পাশ করার পর তিনি DRDO (Defence Research and Development Organisation)-এর Aeronautical Development Establishment-এ একজন বিজ্ঞানী হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ভারতীয় সেনার জন্য একটি ছোটো হেলিকপ্টারের নকশা তৈরির মাধ্যমে। যদিও তখনও তিনি DRDO-তে তাঁর চাকরি নিয়ে আশাবাদী ছিলেন না। ১৯৬৯ সালে তিনি ISRO (Indian Space Research Organisation)-তে যোগদান করেন, যেখানে তিনি ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপনযান (Satellite Launch Vehicle) SLV-III প্রকল্পের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর নিযুক্ত হন, যা ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে সফলভাবে 'রোহিণী' কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর একটি নিম্ন কক্ষপথে (Near-Earth Orbit) স্থাপন করে। ১৯৭০ থেকে ১৯৯০-এর মধ্যে তাঁর Polar Satellite Launch Vehicle-এর প্রযুক্তি তৈরির চেষ্টাও সফল হয়।

১৯৭৪ সালের ১৮ মে রাজা রামন্নার আগ্রহে তিনি দেশের প্রথম পারমাণবিক বোমা

পোখরানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর সঙ্গে কালাম।

'Smiling Buddha' বা পোখরান-১ (ফিসন বম্ব)-এর পরীক্ষণে TBRL (Terminal Ballistics Research Laboratory)-এর পক্ষ থেকে রাজস্থানে যান, যদিও এই প্রকল্পে তাঁর কোনো সরাসরি অবদান ছিল না। ১৯৭০ সালে তিনি সফল SLV প্রকল্পের নীতি ব্যবহার করে আরও দুটি ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রকল্প চালিত করেন। Project Devil ও Project Valiant দুটিই ছিল তরল জ্বালানি চালিত। তৎকালীন ইউনিয়ন ক্যাবিনেটের নিন্দা ও অননুমোদন সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কিছু গোপন ফান্ড থেকে এইসব প্রকল্পের জন্য অনুদান মঞ্জুর করেন। কালাম এবং বিজ্ঞানী ভি এস অরুণাচলম্ তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী আর ভেঙ্কটরমনের উপদেশে একটি প্রকল্পে এক সঙ্গে অনেক মিসাইল তৈরির পরিকল্পনা করেন একটি প্রকল্পে একটিই মাত্র মিসাইল তৈরির বদলে। এই প্রকল্পের নাম হয় IGMDP (Integrated Guided Missile Development Programme)। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঐ প্রকল্পের জন্য ক্যাবিনেটকে ৩৮৮ কোটি টাকা অনুমোদন করতে রাজি করান। এই প্রকল্পের ফলস্বরূপ জন্ম হয় অগ্নি নামক মাঝামাঝি সীমার ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং পৃথ্বী নামক কৌশলী Surface-to-Surface মিসাইল। যদিও এই প্রজেক্টটি অতিরিক্ত অর্থ এবং সময় ব্যবহার করার দায়ে সমালোচিত হয়েছিল।

আবদুল কালাম জুলাই ১৯৯২ থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী এবং DRDO-এর সেক্রেটারির মুখ্য বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা (Chief Scientific Adviser)-র দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়কালেই (১১—১৩ মে, ১৯৯৮) 'অপারেশন শক্তি' বা পোখরান-২ (ফিসন-ফিউসন বম্ব) পারমাণবিক বোমার পরীক্ষণ হয়। যেখানে তিনি একজন দক্ষ রাজনীতিকের পাশাপাশি এই প্রকল্পের চিফ প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই প্রোজেক্টেও তাঁকে সমালোচিত হতে হয়। তবে তিনি সমস্ত বাধা অতিক্রম করেন। এভাবে তিনি প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে এনেছিলেন বিপ্লব, যার জন্য তিনি ১৯৮১ সালে পদ্মভূষণ, ১৯৯০ সালে পদ্মবিভূষণ, ১৯৯৭ সালে ভারতরত্ন, ১৯৯৮ সালে বীর সাভারকর পুরস্কার, ২০০০ সালে রামানুজন পুরস্কার এবং আরও অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হন।

তিনি যে শুধু প্রতিরক্ষাতেই অবদান রেখেছেন তাই নয়, চিকিৎসাক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। অবাক হতে হয়, কোথায় মিসাইল আর কোথায় মেডিসিন! কিন্তু এই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিলেন তিনি। প্রতিরক্ষাবিভাগের বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের স্টেইনলেস স্টিল সেসময় তৈরি করেছিলেন। সেই স্টিল দিয়ে কালাম এবং হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ড. সোমা রাজু প্রফেসর অরুণ কুমার তিওয়ারীর সহযোগিতায় ১৯৯৮ সালে উদ্ভাবন করলেন একটি করোনারি স্টেন্ট। হৃৎপিণ্ডের করোনারি ধমনীতে জমে থাকা কোনো বাধাসৃষ্টিকারী পদার্থ, যা হৃৎপিণ্ডে রক্তচালাচলে সমস্যা সৃষ্টি করে এবং যার ফলে Myocardial Infarction বা Coronary Heart Disease-র মতো মারাত্মক রোগ হতে পারে, তাকে এই স্টেন্টের মাধ্যমে অ্যাঞ্জিওপ্ল্যাস্টি করে সরানো হয়। হৃদরোগ হওয়ার সময় গরিব-ধনী ভেদাভেদ থাকে না ঠিকই, কিন্তু শুধু ধনীরাই এর চিকিৎসার খরচ বইতে পারে। কালামের তৈরি এই স্টেন্ট দিয়ে চিকিৎসার পদ্ধতি যেমন সহজ, তেমনি এর খরচও সবার সাধ্যের মধ্যে। যে স্টেইনলেস স্টিল নৌসেনার ব্যবহৃত জাহাজ তৈরির জন্য আবিষ্কৃত হয়েছিল, তাকে তিনি করোনারি ধমনীতে এমনভাবে প্রতিস্থাপন করলেন যাতে রক্তে দ্রুততম প্রবাহেও স্টেন্টটি একটুও ঢিলে না হয়। স্টেন্টের নাম কালাম-রাজু স্টেন্ট।

২০১২ সালে এই দু'জন মিলে একটি ট্যাবলেট কম্পিউটার তৈরি করেন, যার নাম কালাম-রাজু ট্যাবলেট। প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে চিকিৎসা করেন এমন ডাক্তারদের জন্য এই ট্যাবলেট। এতে ওই ডাক্তারের কাছে যেসব রোগী এসেছেন তাঁদের সকলের রোগের বিস্তারিত তথ্য, রোগ নির্ধারণের বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি, এমনকী Grey's Anatomy ইত্যাদি বই, বিভিন্ন মেডিক্যাল জার্নাল, ম্যাগাজিন ইত্যাদি লোড করা থাকবে। গ্রামে প্র্যাকটিস করতে শুরু করেছেন এরূপ নতুন ডাক্তারদের জন্য এই পদ্ধতি অমূল্য। এভাবে তিনি চিকিৎসাক্ষেত্রেও আনলেন বিপ্লব।

এ পি জে আবদুল কালাম ২০০২ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লক্ষ্মী সায়গল (১,০৭,৩৬৬ ভোট)-কে পরাজিত করে ৯,২২,৮৮৪ ভোট পেয়ে ভারতের একাদশতম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি পদে তিনি কাজ করেছেন 'People's President' হিসেবে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জন্য তিনি তাঁর বাসভবনের দরজা খুলে দেন। নমন নারায়ণ নামে ষষ্ঠশ্রেণীর এক ছাত্র কালামের আত্মজীবনী Wings of Fire পড়ে এতটা অনুপ্রাণিত হয় যে সে তাঁর ছবি এঁকে

ফেলে। বাবা মা তার সেই ছবি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেন। প্রথমে ইতস্তত করলেও সে সেই ছবিটি ডাকে পাঠিয়ে দেয়। কয়েকদিন পর নমনের কাছে উত্তর আসে, ''Dear Naman Narayan, Thank you for your nice drawing. With best wishes from, Dr. APJ Abdul Kalam.''

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও ড. ডাকির হোসেনের পর ভারতরত্ন পাওয়ার পর রাষ্ট্রপতি হয়েছেন এরকম ব্যক্তিত্বদের মধ্যে তিনি তৃতীয়। তবে রাষ্ট্রপতি ভবনে স্থান নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক এবং প্রথম অবিবাহিত।

এখানেও তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে সমালোচিত হয়েছেন অত্যন্ত দয়াবান হিসেবে। কারণ তিনি তাঁর সময়ের ২১ জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দোষীর মধ্যে ২০ জনের সাজা রদ করেন। তিনি প্রকৃতপক্ষেই অত্যন্ত দয়াবান ছিলেন এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাই তার সাক্ষ্য দেয়। DRDO-তে একটি কন্সট্রাকশন চলার সময় তিনি সহকর্মীদের কাছে জানতে চান যে বিল্ডিং-এর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য কী করা যেতে পারে। একজন সহকর্মী বললেন, 'পাঁচিলে কাচের টুকরো গেঁথে দেওয়া যেতে পারে।'' কালাম তাঁকে বললেন, ''তাহলে পাঁচিলে পাখিরা বসতে পারবে না, অন্য কোনো উপায় বলো।'' পাখিদের জন্যও এতটা ভাবেন এরকম ব্যক্তি মানুষের কথা ভাববেন না তা কীভাবে হয়? পাখিদের থেকেও তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, ''সব পাখিই বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় খোঁজে, কিন্তু ঈগল বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে মেঘেরও উপরে নিয়ে যায়''।

তিনি কতটা মাটির মানুষ ছিলেন, তাঁর জীবন তার প্রমাণ। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তিনি একবার ত্রিবান্দ্রমে কেরালা রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতিরা ক্ষমতাবলে নিজের পরিচিত এমন যে কোনো দুজন অতিথিকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। তিনিও দুজন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানান, যাঁরা কেরলে তিনি বিজ্ঞানী থাকাকালীন তাঁকে অনেক সাহায্য

বীণা বাদনরত কালাম।

করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন একজন মুচি এবং একজন খাবার হোটেলের মালিক।

আর এক বারের কথা। ড. কালাম আই আই টি বারাণসীতে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। মঞ্চে পরপর পাঁচটি চেয়ার রাখা আছে, মাঝেরটি তাঁর। মঞ্চে ওঠার সময় তিনি দেখলেন যে তাঁর জন্য সংরক্ষিত চেয়ারটি অন্যগুলোর থেকে বড় আকারের। তিনি সেই চেয়ারটিতে বসতে অস্বীকার করলেন এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে উপাচার্য মহাশয়কে সেই চেয়ারটিতে বসতে অনুরোধ করলেন। উপাচার্য মহাশয় তাঁকে পুনরায় অনুরোধ করলে তিনি বড় চেয়ারটি বদলে অন্য চেয়ারগুলির মতো একটি চেয়ার দিতে বলেন এবং তা দেওয়া হলে তিনি তাতেই বসেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিনি সাধারণ মানুষ হিসেবেই মিশতেন, বিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে নয়।

২০০৭ সালে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ শেষ হয়। তার পরেও তিনি একইরকম সক্রিয় ছিলেন। ২০১২ সালের মে মাসে তিনি একটি দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন শুরু করেন, যার নাম 'What Can Give Movement', ছোটো থেকে বড় সব বয়সের পুরুষ-মহিলা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ধর্মে মুসলমান হয়েও তিনি ভক্তিগীতি শুনতেন, নিয়মিত গীতা পাঠ করতেন, কবিতা লিখতেন, আর ছিলেন শুদ্ধ নিরামিষাশী। তিনি অনেকগুলি কলেজের ভিজিটিং প্রফেসর পদ গ্রহণ করেন। ২০০৩ এবং ২০০৬ সালে MTV Youth lcon of the Year Award-এর জন্য মনোনীত হন। ২০০৬ সালে তাঁকে উৎসর্গীকৃত সিনেমা 'I Am Kalam'-এ রাজস্থানের একটি ছোটো গরিব মেধাবী ছেলে ছোটুর জীবনী অঙ্কিত হয়। ছেলেটি নিজের নাম কালাম রাখে, কারণ কালামকে সে তার আদর্শ বলে মনে করে।

পরিশ্রমই সাফল্যের চাবিকাঠি, তা তাঁর বিখ্যাত বাণীগুলিতে ফুটে ওঠে— ''তুমি যদি সূর্যের মতো উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে চাও, তবে প্রথমে সূর্যের মতো পুড়তে শেখো (If you want to shine like a sun, first burn like a sun)''। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে সাফল্য আসে, তাতে আনন্দ অনেক বেশি হয়, তাঁর ভাষায়, ''Man needs difficulties in life because they are necessary to enjoy the success.'' তাঁর মতে, সকলে সমান প্রতিভা নিয়ে না জন্মালেও সকলেই জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারে

: All of us do not have equal talent. But all of us have an equal opprtunity to develop our talents. (সকলে সমান প্রতিভা নিয়ে জন্মায় না, কিন্তু প্রতিভা গড়ে নেওয়ার সুযোগ সবাই সমানভাবেই পায়)। আর সাফল্যের আনন্দে ভেসে যাওয়ার পাত্রও তিনি নন। তিনি বলতেন, ''প্রথম সাফল্যের পর আরাম কোরো না, কারণ পরের পরীক্ষায় যদি কোনোভাবে হেরে যাও, বেশিরভাগ লোক বলবে যে প্রথমবার তুমি শুধু ভাগ্যের বলে সফল হয়েছিল। (Don't take rest after your first victory, because, if you fail in second, more lips are waiting to say that your first vicotory was just luck.)"

২০১১ সালে কুড়ানকুলম নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে তাঁকে পুনরায় সমালোচিত হতে হয়। অধিগৃহীত অঞ্চলের অধিবাসীরা অভিযোগ করে যে এই প্রকল্প শুরুর আগে তাদের মতামত নেওয়া হয়নি, তাছাড়া তাদের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করা হয়নি।

তাঁর লেখা বইগুলির চাহিদা পৃথিবীব্যাপী এবং বইগুলি সব ধরনের মানুষের জন্য প্রেরণাদায়ী। তাঁর আত্মজীবনী 'Wings of Fire : An Autobiography' (1999)। এছাড়া আছে 'India 2020 : A Vision for the New Millenium' (1998), 'Ignited Minds : Unleashing the Power Within India' (2002), 'The Luminous Sparks Sparks' (2004) ও আরও অনেক বই। তাঁর সাম্প্রতিকতম বইটি হলো, 'Transcendence My Spritual Experience with 'Pramukh Swamiji' (জুন ২০১৫; Harper Collins India Publication)। ভারতে তো বটেই, দক্ষিণ কোরিয়াতেও এই বইগুলির অনুদিত মুদ্রণের জনপ্রিয়তা চোখে পড়ার মতো।

স্কুলছাত্রছাত্রীদের তিনি প্রচণ্ড স্নেহ করতেন। এজন্য ভারতের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে বিভিন্ন সময় তাঁর ডাক পড়তো। নিজের জ্ঞান এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে তিনি তাদের মধ্যে বিজ্ঞানস্পৃহা জাগিয়ে তুলতেন। আর ছাত্রছাত্রীরাও তাঁর বাচনভঙ্গী ও গভীর আন্তরিকতার কারণে তাঁর বক্তৃতার জন্য অপেক্ষা করে থাকত। একবার তিনি একটি ছোটো স্কুলে ভাষণ দিতে গিয়েছেন। ভাষণ শুরুর সময়ই হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। কিন্তু তিনি বিদ্যুৎ ফিরে আসার অপেক্ষা না করে জমায়েত হওয়া চারশো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ান এবং তাদেরকে তাঁর চারপাশে ঘিরে দাঁড়াতে বলে খালি গলায় বক্তৃতা শুরু করে দেন।

আরও একবার আমেদাবাদ IIM-এ এক অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। মূল অনুষ্ঠানের একটু আগে তিনি কলেজের প্রায় ষাটজন ছাত্রকে নিয়ে একটি ক্লাশ করেন। ক্লাসের শেষে ছাত্ররা প্রত্যেকে তাঁর সঙ্গে একটি করে ফোটো তুলতে চাইছিল, কিন্তু অনুষ্ঠান শুরুতে দেরি হয়ে যাবে বলে উদ্যোক্তারা তাদের নিরস্ত করতে তৎপর হন। ড. কালাম সবাইকে অবাক করে দিয়ে উদ্যোক্তাদের বলেন, ''আপনারা শান্ত হোন, আমি এখান থেকে যাব না যতক্ষণ না এখানকার সব ছাত্র ইচ্ছেমতো আমার সঙ্গে নিজেদের ফোটো তুলে নেয়।"

আর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভারতীয়রা যতটা দেখিয়েছে, ততটাই দেখিয়েছে অভারতীয়রাও। কারণ 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।' ২০১০ সালের ১৫ অক্টোবর তাঁর ৭৯তম জন্মবার্ষিকী যুক্তরাষ্ট্রে 'বিশ্ব শিক্ষার্থী দিবস (World Student's Day)' হিসেবে পালিত হয়েছিল। সারা পৃথিবীর ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হয়। ২০০৭ সালে রয়াল সোসাইটি থেকে King Charles II Medal, ২০০৯ সালে আমেরিকার ASME থেকে হুভার মেডেল, ক্যালিফোর্নিয়া ইনসটিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে International Von Karman Wings Award এবং আরও অনেক পুরস্কারে তাঁকে ভূষিত করা হয়। ২০০৫ সালের ২৬ মে তিনি সুইজারল্যান্ড সফরে গেলে সুইজারল্যান্ড সরকার ওই দিনটি 'বিজ্ঞান দিবস' হিসেবে উদযাপন করে। ২০১৩ সালে ন্যাশানাল স্পেস সোসাইটি তাঁকে Von Braun Award দিয়ে সম্মানিত করে।

ওই বছর সান দিয়াগোতে ISDC (International Space Development Conference)-এ কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যায়। কালাম তখন সান্ধ্যভোজনে ব্যস্ত ছিলেন। তারা গেলে তিনি খাওয়া ছেড়ে তাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি তাদের একজনকে তাঁর প্লেট থেকে কোনো খাবার তুলে নিতে বলেন। ছাত্রটি প্রথমে অবাক হয়ে যায়, কিন্তু তিনি পীড়াপীড়ি করলে সে এক টুকরো পালংশাক তাঁর প্লেট থেকে তুলে নেয়। সে পরে সোশাল সাইটে লেখে, ''...I take it to be a leaf of Inspiration from him and the best dinner I coul ever imagine."

গত ২৭ জুলাই শিলং-য়ে Indian Institute of Management-এ তিনি একটি বক্তৃতা দিতে যান, যার বিষয় ছিল 'বাসযোগ্য বসুন্ধরা (The Livable Planet Earth)'। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বক্তৃতা চলাকালীন হঠাৎ তিনি মঞ্চেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। গম্ভীর অবস্থায় তাঁকে বেথানিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দু' ঘণ্টা পরে এক তীব্র কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর, এবছর অক্টোবরে তাঁর বয়স ৮৪ বছর পূর্ণ হোত। মৃত্যুর খবর প্রচারিত হতেই সারা দেশ, বস্তুত সারা পৃথিবী মর্মাহত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, রাশিয়া, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ শোকবার্তা পাঠিয়ে সেই দুঃখে সামিল হন।

তিনি নশ্বরদেহ ত্যাগ করে চলে গেছেন ঠিকই, কিন্তু যতদিন পৃথিবীতে মানুষ থাকবে, ততদিন তাঁর বাণী, তাঁর জীবন আমাদের সৃজনশীল সত্তাকে অনুপ্রাণিত করে যাবে, আমাদের পরাজয়ের হতাশা-গ্লানিকে দূরে ঠেলে এগিয়ে যেতে শেখাবে। এদেশের মাটিতেই আবার জন্মাবে কালাম, গীত হবে বিজ্ঞানের জয়গান!

(লেখক ব্যাচেলার অব ডেন্টাল সায়েনস্-এর ছাত্র)

খুদে গবেষক পৃথ্বীক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রত্যেকের জীবনেই শৈশবটা একইভাবে যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম থাকে তাও অস্বীকার করা যায় না। এরকমই এক কিশোর পৃথ্বীক সিনহা ধরচৌধুরী। এই বঙ্গসন্তানের প্রিয় বিষয় ডায়নোসরাস। মাত্র এগারো বছর বয়সেই তার গবেষণার বিষয় বিরল প্রজাতির ডায়নোসরাস-সহ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীসমূহ এবং তেজস্ক্রিয়তার রূপান্তর ও অঙ্গ পুনর্গঠন।

আদতে বঙ্গসন্তান হলেও তার বর্তমান ঠিকানা দুবাই। পৃথ্বীকের বাবা কর্মসূত্রে দুবাই থাকার কারণে বাংলার সঙ্গে এখনও সেইভাবে পরিচয় হয়ে ওঠেনি তার। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত সে। পৃথ্বীকের মা দুবাইয়ের এক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মসহ একটি মিডিয়া হাউস পরিচালনা করেন। ফলে ২৭০টি প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীর মডেল তার সঙ্গী। যেখানে এগারো বছর বয়সী অন্যান্য শিশুদের ঘর রিমোট কন্ট্রোল, খেলনা গাড়ি, ব্যাট-বল, ফুটবল সহ অন্যান্য খেলার সামগ্রীতে ছড়ানো ছিটানো থাকে সেখানে পৃথ্বীক এক ব্যতিক্রমী শিশু। জীবপ্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক হাজারো চিন্তা তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। এই কিশোর বয়সেই দু-দুটো বই লিখে ফেলেছে পৃথ্বীক। 'হোয়েন ডায়নোসরাস রোমড দ্য আর্থ', 'ইমপাক্ট অফ রেডিওঅ্যাকটিভ অ্যান্ড নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট অন মেরিন এবং ল্যান্ড স্পিসিস' নামক বই দু'টি জীবপ্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে অন্যতম হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি তাঁদের ভাবিয়ে তুলেছে এত অল্প বয়সে তেজস্ক্রিয়তার রূপান্তর এবং অঙ্গ পুনর্গঠনের মতো বিষয়গুলি নিয়ে কী করে ভাবতে পারছে এই কিশোর। পৃথ্বীকের মতো একটি ছোট শিশুর ব্যতিক্রমী কাণ্ডকারখানা শুনলে আরও অবাক হতে হয়। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে একদিন রাতে খাবার সময় হঠাৎই সে দাদুকে প্রশ্ন করে বলে, 'মাধ্যাকর্ষণ বল কী এবং কেন সবকিছু কৃষ্ণগহ্বরে শেষ হয়?' এরকমই একটি প্রশ্ন শুনে পরিবারের সদস্যরা হতবাক, প্রথমদিকে তারা গুরুত্ব না দিলেও পরে তার মায়ের মনে হতে থাকে তার ছেলে বিরল অটিজমের শিকার। এ প্রসঙ্গে পৃথ্বীকের মা ইন্দিরা ধরচৌধুরী জানান, 'মাত্র তিন বছর বয়সেই পৃথ্বীক তার পছন্দের এই বিষয় বেছে নেয়। যখন তার বয়স মাত্র পাঁচ তখনই সে বই লিখতে শুরু করে এবং সাত বছর বয়সে সে ভাবতে শুরু করে পরবর্তীকালে তাকে কী করতে হবে।' এই বয়সেই সে প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল নিয়ে ধারবাহিকভাবে কয়েকটি বই প্রকাশ করে এবং বর্তমানে তৃতীয় বই প্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পৃথ্বীক মনে করে প্রত্নজীববিদ্যার প্রতি আগ্রহই তাকে বুঝতে সাহায্য করেছে অভিব্যক্তি সম্পর্কে। পরবর্তীকালে সে বুঝেছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও পারমাণবিক বর্জ্যের ফলে প্রাণীজগতে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনকে। ইতিমধ্যে দেশ বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক পড়েছে তার। অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সামনে প্রত্নজীবতত্ত্ব ও তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব নিয়ে বক্তৃতা রেখেছে সে। মাত্র আট বছর বয়সেই 'এমিরেটস এনভায়রনমেন্টাল গ্রুপস্ নবম কমিউনিটি লেকচার অফ দ্য ইয়ার' অনুষ্ঠানে পঁচাত্তরের অধিক পরিবেশবিদ, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও ছাত্রদের সামনে বক্তব্য রেখে তাবৎ বিদ্বজ্জনকে বিমোহিত করে দিয়েছিল এই ছোট্ট ছেলেটি। এছাড়াও গত দু'বছর আগে ২০১৩-এর জানুয়ারি মাসে জার্মানির সানকেনবার্গ নাটার মিউজিয়াম ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে সে আমন্ত্রণ পায় বিখ্যাত প্রত্নজীবতত্ত্ববিদ ড. বার্নড হার্কনারের সঙ্গে বই বিনিময় ও প্রাগৈতিহাসিক যুগ নিয়ে আলোচনার জন্য। তবে এসব কিছুতে গভীর আগ্রহ থাকলেও স্কুলের নির্দিষ্ট পাঠক্রম ভিত্তিক পড়াশোনায় তার প্রচণ্ড অনীহা। তাই স্কুলে গিয়ে ক্লাসেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। বর্তমানে পৃথ্বীককে পরিবেশগত পরিবর্তন ভাবিয়ে তুলেছে। মানব সৃষ্ট পারমাণবিক বর্জ্যের প্রাথমিক উৎস যেমন হিরোসিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ-সহ চেরনোবিল, ফুকুশিমা সহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের পরমাণু বোমা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে যে পরিবর্তন ঘটেছে তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে সে। এছাড়াও সে মনে করে যে সরীসৃপের সঙ্গে মানুষের নির্দিষ্ট কিছু ডি এন এ-এর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অঙ্গ পুনরুৎপাদন বা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়া অঙ্গ পুনর্গঠনও সম্ভব। তাই সরীসৃপবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছে পৃথ্বীক। তবে অসাধারণ মেধাকে কাজে লাগিয়ে যখন সে একের পর এক অসাধ্য সাধন করে চলেছে তখন নানান ব্যাধিতে তার প্রগতির পথ প্রায় রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। জন্ম থেকেই কিডনির সমস্যায় জর্জরিত পথ্বীক। কিডনির ৫০ শতাংশ বিকল। পাশাপাশি শরীরে যততত্র গজিয়ে উঠেছে টিউমার। ফলে কিছুটা হলেও ব্যহত হচ্ছে তার কাজ। কিন্তু মনের জোরে এগিয়ে চলেছে এই বঙ্গ সন্তান। ■

অন্য রকম

ARE YOU SEARCHING FOR A PROPERTY PLANNER ?

PROPERTY

BUY SALE RENT

Contact
DILIP KUMAR JHAWAR 9831172945
RANAJIT MAZUMDAR 9339861465

S M WEALTH INFRAREALTOR LLP | 52 /E BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, KOLKATA 700019
Email : info@smwealth.co | Web Link : www.smwealth.co

এক ঝলকে ঠাকুর, মা, স্বামীজী

ড. তিলক রঞ্জন বেরা

ঠাকুর, মা, স্বামীজী সম্পর্কে বইয়ের অভাব নেই। পাঠকেরও অভাব নেই। এই ত্রয়ী সম্পর্কে যতই আলোচনা শুনি বা পাঠ করি— ততই নতুন মনে হয়। সারা বিশ্বে এই ত্রয়ী সম্বন্ধ এক অভিনব ও যুগান্তকারী। অনেকের মতো ড. কৌশিক ভট্টাচার্য ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জীবনী পাঠ করে তাঁদের সম্বন্ধ ও সান্নিধ্য ছোট আকারে সহজভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যা পাঠক বর্গের কাছে মনোরম, বিশেষ করে কচিকাঁচাদের খুবই উপযোগী। আজকের যুগে ছাত্র-যুবকদের বই পড়া কমে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আলোচ্য 'ঠাকুর-মা-স্বামীজী সান্নিধ্য' বইটি প্রতিদিন চলার পথে খুবই একান্ত হিসাবে ব্যবহৃত হবে। একথা বড়দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বললে খুব অত্যুক্তি হবে না। কারণ আজকের ব্যস্ততার যুগে দৈনন্দিন আমাদের পক্ষে আলমারি থেকে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জীবনীমূলক বই বের করে পড়ার সময় হয়ে ওঠে না বা মনও চায় না, সেক্ষেত্রে এই বইটি ছোট্ট ডাইরির মতো ব্যাগে থাকলে প্রতিদিন চলার পথে কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ত্রয়ীর দর্শন ও মনন করা সম্ভব হবে। ড. ভট্টাচার্য অল্প পরিসরে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জীবনের মূল অংশগুলি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন যা সকলেরই জানা কিন্তু বারবার অনুধ্যানযোগ্য। প্রতিদিন একবার করে পুরো বই পাঠ করলে মনের মণিকোঠায় ঠাকুর-মা-স্বামীজীর স্পর্শ একটু হলেও পাওয়া যাবে।

লেখক প্রথমে তাঁদের জীবনী উপস্থাপিত করেছেন। পর্যায়ক্রমে তাঁর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ঠাকুর কীভাবে নরেনকে পেয়েছেন ও নরেন কীভাবে ঠাকুরকে গ্রহণ করেছেন— লিপিবদ্ধ করেছেন। ঠাকুরের সান্নিধ্য নরেন মাত্র পাঁচ বছর পেয়েছেন, পরে ১২ বছর শ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে কীভাবে সারবিশ্ব জয় করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঠাকুরের নরেন আকুলতা অংশ লেখক বিন্দু আকারে ঘটনাগুলি পরিবেশন করেছেন। ভাবলে অবাক হতে হয় যে জানা ঘটনাগুলি আবার যেন নতুনভাবে পড়ছি। এক্ষেত্রে লেখক 'স্বামীজীর রামকৃষ্ণ সাধনা' গ্রন্থটির যথার্থ ব্যবহার করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে 'মদীয় আচার্যদেব' গ্রন্থটির মূল অংশগুলি যথাসম্ভব ব্যবহার করে স্বামীজীর ঠাকুর ভক্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। দু' এক জায়গায় মুদ্রণপ্রমাদ বাদ দিলে সার্বিকভাবে বইটি দৃষ্টিনন্দন, তবে প্রকাশ পূর্বে লেখকের আর একটু সচেতন হলে আরও সুন্দর হোত। সবশেষে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর উপদেশগুলি আলাদাভাবে বিন্দু আকারে পরিবেশন করার জন্য লেখক বিশেষভাবে ধন্যবাদের যোগ্য। সেইসঙ্গে প্রচ্ছদ খুবই সুন্দর। ব্যাগ থেকে বের করে একবার করে দর্শন ও প্রণাম করলেও সারাদিনের চলার পথ সুগম হবে।

ঠাকুর-মা-স্বামীজী সান্নিধ্য,
ড. কৌশিক ভট্টাচার্য। মূল্য : ৩০ টাকা।

'যখন নারীগণ তাঁদের জন্মভূমির যে গৌরবময় অতীত থেকে তাঁরা সঞ্জাত, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যথাস্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত দেখবেন, তাঁরা স্বজাতির প্রয়োজনের বিশালতা সম্বন্ধে সচেতন হবেন, তাঁদের মাতৃহৃদয় কেবল পরিবার, গ্রাম এবং বাস্তুভিটার পরিবর্তে স্বদেশ এবং স্বজাতির জন্য স্পন্দিত হতে শুরু করবে, তাঁদের মন সেই মাতৃহৃদয়কে জানবার কাজে নিযুক্ত হবে, তখন কেবল তখনই ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ তার প্রকৃত মহিমা নিয়ে জাতির নিকট আত্মপ্রকাশ করবে।' — ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ত্রিপুরায় চার প্রচারকের আত্মবলিদান স্মরণ

১৯৯৯ সালের ৬ আগস্ট ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার নিকটবর্তী কাঞ্চনছড়া থেকে অপহৃত হন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের চার কার্যকর্তা— সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত, দক্ষিণ অসমের প্রচারক দীনেন্দ্রনাথ দে, আগরতলা বিভাগ প্রচারক সুধাময় দত্ত এবং জেলা-প্রচারক শুভঙ্কর চক্রবর্তী। জঙ্গি সংগঠন এন এল এফ টি অপহরণের দায় স্বীকার করে নেয়। তার দু' বছর বাদেও এঁদের খোঁজ না মেলায় ত্রিপুরা সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এঁদের মৃত বলে ঘোষণা করে। দেশের কাজে এহেন আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত আগামীদিনে শিক্ষণীয় এবং ইদানীন্তনকালে বিরল। তাই এই ঘটনাকে স্মরণে রেখে এর পনেরো বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ৬ আগস্ট ত্রিপুরায় শাখার শাখায় কার্যক্রম আয়োজিত হয়। পরে আগরতলার সেবাধামে এই উপলক্ষে আয়োজিত এক স্মরণসভায় আর এস এসের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তা দীপক দেব, পীযূষ চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়।

স্বদেশ বিকাশ কেন্দ্রের সেবা সম্মেলন

গত ২ আগস্ট সমাজ সেবা ভারতী (পশ্চিমবঙ্গ) অনুমোদিত সেবা সংস্থা আসানসোলের স্বদেশ বিকাশ কেন্দ্রের সেবা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আসানসোলের গুজরাটি ভবনে স্বদেশ বিকাশ কেন্দ্র পরিচালিত বাইশটি সেবাকেন্দ্রের কার্যকর্তা, শিক্ষক/শিক্ষিকারা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহু শুভানুধ্যায়ী। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় বি সি কলেজের অধ্যক্ষ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় প্রতিবন্ধী ক্রিকেট সংস্থার পূর্বাঞ্চলের সংগঠক এবং বাংলা দলের কোচ এবং অভিভাবক বিদ্যুৎ কুমার দে, প্রান্ত সেবা প্রমুখ মনোজ চট্টোপাধ্যায়, সমাজ সেবা ভারতীর প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক ধনঞ্জয় ঘোষ, বিশিষ্ট চিকিৎসক শিবশঙ্কর প্রসাদ সিং, আসানসোল মহকুমা সঙ্ঘচালক লক্ষ্মণলাল গুপ্তা প্রমুখ। শিশু সংস্কার কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা নাচ, গান, শ্লোক, আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় করে তোলে। সেলাই শিক্ষা কেন্দ্রের মহিলারা তাঁদের তৈরি বিভিন্ন পোশাক প্রদর্শন করেন। এই অনুষ্ঠানে সম্মান জানানো হয় সমাজসেবী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বক্তব্য রাখেন ধনঞ্জয় ঘোষ, বিদ্যুৎ কুমার দে, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। স্বদেশ বিকাশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সেবা কেন্দ্রগুলির জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের হাতে হোয়াইট বোর্ড, মা সরস্বতীর ফটো, ভারতমাতার ফটো, ওঁ-লকেট, বই তুলে দেওয়া হয়।

সমাবেশ সমাচার

কালিয়াগঞ্জের পৌরোহিত্য প্রশিক্ষণ শিবির

গত ৮ থেকে ১২ জুলাই উত্তরবঙ্গের কালিয়াগঞ্জে শ্বেত কলোনিতে ৫ দিনের এক পৌরোহিত্য প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কালিয়াগঞ্জ পুরোহিত মঞ্চের ৩০ জন পুরোহিত এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংগঠন সম্পাদক গৌতম সরকার স্থানীয় কার্যকর্তাগণ এই শিবিরের ব্যবস্থা করেন। ভারত সংস্কৃত পরিষদের আচার্য কমলাকান্ত ও পণ্ডিত শক্তিপদ চক্রবর্তী এই শিবিরে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বেলা ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত এই শিবির চলে। সাধারণ পূজা, দুর্গাপূজা, বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া শ্রীশ্রী চণ্ডীর ছন্দ, সুর, উচ্চারণ, লঘুগুরু স্বর, অর্থ, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। পুরোহিত মঞ্চের সম্পাদক প্রশান্ত চক্রবর্তী জানালেন, তাঁরা গরিব মানুষকে বস্ত্রদানের কার্যক্রমও করেন। অজিত মজুমদার জানান, শিক্ষার্থীগণ এই প্রশিক্ষণ শিবির থেকে বিস্তৃত জানবার সুযোগ পেল।

শোকসংবাদ

চন্দ্রকোণা রোডের স্বয়ংসেবক তাপস মিশ্রের অগ্রজ অরুণ মিশ্র গত ২৬ জুলাই রাত্রে পরলোকগমন করেন। তিনি চন্দ্রকোণা রোড হিন্দু সেবা সমিতির স্থায়ী সভাপতি হিসেবে সমাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ৫ আগস্ট তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয়েছে।

***

বীরভূম জেলার সিউড়ীর সরোজিনীদেবী সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী স্নেহময়ী বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৫ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বৎসর। তিনি সাত পুত্র ও চার

কন্যার জননী। শিশু মন্দিরের আচার্য ও আচার্যদের খুবই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর এক পুত্র প্রিয়াংশু বন্দ্যোপাধ্যায় শিশুমন্দিরের দিবা বিভাগের আচার্য।

বেহালায় ভারতমাতা পূজা ও অখণ্ড ভারত দিবস পালন

গত ১৪ ও ১৫ আগস্ট বেহালায় ভারতমাতা পূজা ও অখণ্ড ভারত দিবস পালিত হয়। আয়োজক বেহালা ভারতমাতা পূজা কমিটি। ১৪ আগস্ট সন্ধ্যায় পূজারতির পর বক্তব্য রাখেন রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেশবরাও দীক্ষিত। ৮০০ জন প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১৫ আগস্ট ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

***

অখণ্ড ভারত দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১৫ আগস্ট হাওড়া জেলার ডোমজুড় খণ্ডের বেগড়ীগ্রামে ভারতমাতা পূজন সমিতির উদ্যোগে এবং বেগড়ী বিবেকানন্দ সেবা সমিতি সহযোগিতায় ভারতমাতা পূজা হয়। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর এলাকায় ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার্থে রাখিবন্ধন করা হয়। ভারতমাতা পূজায় বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্র পাঠ করে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। বিকালে পূজামণ্ডপেই প্রকাশ্য সমাবেশে ভারতের গৌরবময় অতীতের কথা স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তা মৃণাল কাঞ্জিলাল এবং হাওড়া জেলার স্বয়ংসেবক শিবশঙ্কর বেজ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বেগড়ী বিবেকানন্দ সেবা সমিতির সভাপতি রূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। সারাদিনের এই কার্যক্রমে এলাকার মানুষ উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

পরলোকে প্রবীণ প্রচারক সত্যব্রত সিংহ

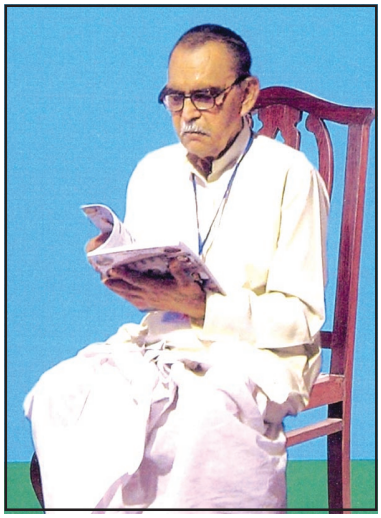

গত ১৮ আগস্ট প্রয়াত হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক সত্যব্রত সিংহ। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি কিছুদিন কলকাতার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। এদিন দুপুর ২.২৫ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৮০ বছর আয়ুষ্কালে তাঁর প্রয়াণ ঘটল।

জন্ম—বহরমপুর শহরে।

পরিবার ---পিতা-ভবানীচরণ সিংহ, মা-বীণাপাণি দেবী, চার ভাই ও তিন বোন।

শিক্ষা—পদার্থবিদ্যায় স্নাতক।

কর্মজীবন—বীরভূম জেলার একটি স্কুলে ২২ বছর বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকতা করেন।

প্রচারক জীবন—বর্ধমান, ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর বিভাগ প্রচারক, প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ ও বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের দায়িত্ব পালন করেন।

শিলিগুড়িতে কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা

গত ২৬ জুলাই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে শিলিগুড়ির তেরাপন্থ ভবনে কৃতী বিদ্যার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ বিভিন্ন স্কুলের ৩০০ জন ছাত্রছাত্রীকে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ এন আর হালদার ও ডাঃ দেবব্রত মিত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যার্থী পরিষদের উত্তরবঙ্গ সম্ভাগ সংগঠনমন্ত্রী কে ঈশ্বর, রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক নন্দিনী ঠাকুর, শিলিগুড়ি সহ-বিভাগ প্রমুখ ত্রিদীপ সাহা, শিলিগুড়ি জেলা সংযোজক সঞ্জয় মাহাতো, শিলিগুড়ি জেলা প্রমুখ গণেশ কামতি।

বারুইপুরে সংস্কারভারতীর নটরাজ পূজা

অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে গত ১৯ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর পদ্মপুকুর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয় গুরুপূর্ণিমা উৎসব ও নটরাজ পূজা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নট ও নাট্যকার বীরেন্দ্রনাথ পুরকাইত। সংবর্ধনা দেওয়া হয় বিশিষ্ট সেতার বাদক এবং সাহিত্যিক দেবকুমার সেনগুপ্তকে। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সুবক্তা ত্রিদীব মণ্ডল। নটরাজ পূজার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন প্রাদেশিক সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুজিত চক্রবর্তী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শুভঙ্কর মুখার্জী, বিশিষ্ট লেখক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, সনৎ ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে। সেতার বাদন-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

শ্রীগুরুপূর্ণিমায় শিল্পী সংবর্ধনা সিউড়ী সংস্কার ভারতীর

বীরভূম জেলার সিউড়ীর প্রবাদপ্রতিম হরবোলা শিল্পী দুলাল দাস-কে সংবর্ধনা জানাল সিউড়ী সংস্কার ভারতী। সংস্থার পক্ষ থেকে এদিন শ্রীদাসকে উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক, মানপত্র, ফল ও মিষ্টান্ন দিয়ে বরণ করে নেয় সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বরলিপি দাস, হৈমন্তী পাল, সুজাতা দাস, বাবলী মণ্ডল, শুক্লা ঘোষ প্রমুখ। নৃত্য পরিবেশন করেন সপ্তিকা ঘোষ ও সৌমী মণ্ডল। উল্লেখ্য, এদিন শ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব পালনের সঙ্গে সঙ্গে নটরাজ পূজাও হয়।

ডাঃ হেডগেওয়ার ব্যাখ্যানমালা

গত ৯ আগস্ট শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে মহাজাতি সদনের অ্যানেক্সে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তীবর্ষ উপলক্ষে একটি ব্যাখ্যানমালার আয়োজন করা হয়। ব্যাখ্যানমালায় 'রাষ্ট্রোন্নতি কা হেডগেওয়ার মার্গ : আজ কী প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে প্রধান বক্তারূপে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর চেয়ারম্যান বলদেবভাই শর্মা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় এবং সভাপতি হিসেবে ছিলেন দ্য পাইওনিয়ার পত্রিকার সম্পাদক চন্দন মিত্র।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুস্তকালয়ের উপদেষ্টা যুগলকিশোর জৈথলিয়া। কার্যক্রম পরিচালনা করেন মহাবীর বাজাজ এবং ধন্যবাদ জানান পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী।

বিস্মৃতপ্রায় এক বরণীয় শিল্পী অখিলবন্ধু ঘোষ

বিকাশ ভট্টাচার্য

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে রত্ন যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গান'। সত্যিই, বাঙালির একান্ত নিজস্ব ও পরম অর্জন তার গান। বাংলা গান। বাংলা গানের জগৎ নানা সময়ে সমৃদ্ধ করেছেন বহু গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী। এঁদের কৃতি সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই তেমন ওয়াকিবহাল নন। বিশেষত আজকের প্রজন্ম। আজ যাদের বয়স ষাট-সত্তর হবে, তাদের হয়তো মনে থাকবে তাদের যৌবনে 'অনুরোধের আসর' বা জলসায় শোনা গান— 'পিয়াল শাখার ফাঁকে ওঠে এক ফালি চাঁদ বাঁকা ওই। তুমি আমি দু-জনাতে বাসর জেগে রই' বা 'ও দয়াল বিচার কর', 'যেন কিছু মনে করো না', 'বাঁশরিয়া বাঁশী বাজায়ো না', 'তোমার ভুবনে ফুলের মেলা আমি কাঁদি সাহারায়'। এইসব মরমিয়া গান আজও আমরা ভুলতে পারি না। ভুলতে পারি না এইসব গানের শিল্পী অখিলবন্ধু ঘোষকে।

অখিলবন্ধুর জন্ম ১৯২০ সালে। গান শিখেছেন কালিদাস গুহ, নিরাপদ মুখোপাধ্যায় ও তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে। রেকর্ডে গেয়েছেন মূলত আধুনিক, তাছাড়া রাগপ্রধান ও নজরুলের গান। তাঁর আধুনিক গানের এক স্বতন্ত্র স্বাদ আছে। কোনো গান রাগভঙ্গিম, কোনো গান আবার নাট্যরসসিক্ত। প্রথম রেকর্ড, 'একটি কুসুম যবে' ও 'আমার কাননে ফুটেছিল ফুল' (জে. এন. জি ৫৮৪০) ১৯৪৬-৪৭ সাল নাগাদ। বেশিরভাগ রেকর্ড বেরিয়েছে মেগাফোন থেকে। বাংলা রাগপ্রধান গানে তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুরে অজয় চক্রবর্তীর রাগপ্রধান গানের লংপ্লেয়িং রেকর্ড বেরোনোর অনেক আগে অখিলবন্ধু ঘোষের বাংলা রাগপ্রধান গানের লংপ্লেয়িং বের হয়। অনবদ্য সেই সব গান। 'আজি চাঁদিনী রাতি গো', 'আজি শ্যামবিহনে বৃন্দাবনে, কাটে না শ্রীরাধার মন'— এমন বেশ কিছু গান তাঁর অপূর্ব গায়েকী ও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। বেতারে তিনি খেয়াল, ঠুংরিও গেয়েছেন। রেকর্ডের গানে অধিকাংশের সুরকার তিনি নিজেই। দু-একটি গানে তাঁর স্ত্রী দীপালি ঘোষও সুর দিয়েছেন।

এই প্রতিবেদকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সত্তরের দশকে। সেই সময় আমরা কয়েকজন বন্ধু বেশ কিছু অফবিট সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতাম রবীন্দ্রসদনে। অনুপ ঘোষাল তখন গুগাবাবার গান গেয়ে ফাংশন জমাচ্ছেন। তাঁর প্রথম নজরুলগীতির একক অনুষ্ঠান

আমরাই করি। তারপর থেকে তিনি ফাংশনে নজরুলগীতি গাওয়া শুরু করেন। এরপর বাংলা রাগপ্রধান গানের অনুষ্ঠান করি। ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, প্রসূন ও মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে আসরে বসেন অখিলবন্ধু। সারেঙ্গীতে সাগিরুদ্দিন আর তবলায় কেরামতুল্লা। অভূতপূর্ব সেই অনুষ্ঠান। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত সমালোচক শার্ঙ্গদেব (রাজ্যেশ্বর মিত্র) দেশ পত্রিকায় অনুষ্ঠানের আলোচনায় অখিলবন্ধুর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিরাট মাপের বরণীয় এই শিল্পীর শেষ জীবনটা খুবই কষ্টের মধ্যে কাটে। আমি আমার পরিচিত মহলে, বিভিন্ন ব্যাঙ্কে বেশকিছু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করি। একবার ৮০-৮১ সাল নাগাদ তিনি কলামন্দিরে একটা একক গানের অনুষ্ঠান করি। তবলায় ছিলেন রাধাকান্ত নন্দী। অনুষ্ঠান তখনও শুরু হয়নি। একজন এসে আমায় বললেন আমায় বাইরে কেউ ডাকছেন। হল থেকে বেরিয়ে দেখি গেটের কাছে একটা কালো গাড়ি। এগিয়ে সামনে যেতে গাড়ির কাঁচ নামিয়ে মুখটা একটু বাড়িয়ে বললেন, তুমি গৌরীদার ছেলে না? তাইতো ভাবি এই বয়সে অখিলের একক অনুষ্ঠান কে করছে! ওর সঙ্গে আমি একটু দেখা করতে পারি। অবশ্যই, বলে ওঁকে নিয়ে গ্রিনরুমে গেলাম। দরজা খোলার আগে আমায় ইসারায় চুপ করতে বলে, জামার পকেট থেকে একটা রজনীগন্ধার মালা নিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আচমকা শিল্পীর কণ্ঠে মালাটা পরিয়ে তিনি বললেন, অখিল তুই একক করছিস্। আমায় ডাকলি না। অখিলবন্ধু বিস্ময়ে, আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন, ধন্য তুই! এরপর দুই বরণীয় শিল্পী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন। অখিলবন্ধু ঘোষ ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। আমার চোখ দু'টো তখন ভিজে উঠেছে।

১৯৮৮ সালের ২০ মার্চ শিল্পী পরলোকগমন করেন। ▮

শব্দরূপ-৭৬০ শ্যামাপ্রসাদ দাশ

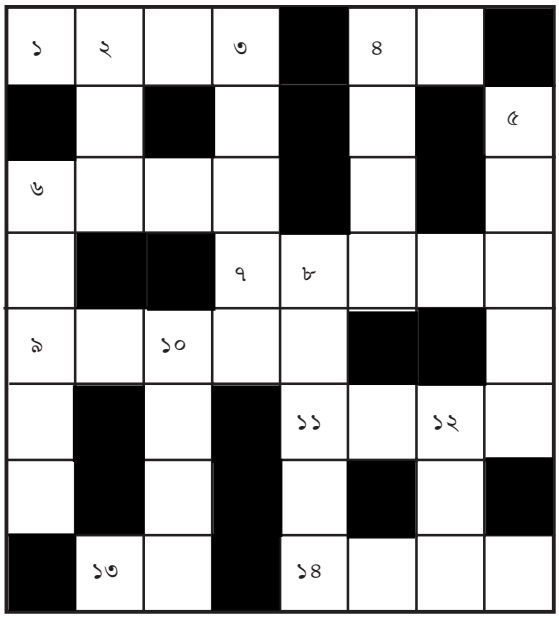

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. অকর্মণ্য, স্থবিরলোক, **৪.** ভোমরা; 'গুঞ্জরিয়া আসে—', **৬.** শেষে বাজনা রেখে বাহুভূষণ, **৭.** প্রাইভেট সেক্রেটারি, **৯.** যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহ নির্মাণকারী শিল্পী, **১১.** হাতি, **১৩.** বুনো কুকুর, মাঠে ও ক্ষেত্রে জল বের হবার গর্ত, **১৪.** যম; — ব্যাধি।

উপর-নীচ : ২. পাইনগাছের আঠা, **৩.** নেকড়ে বাঘ, **৪.** শিশুপাঠ্যে এ তেড়ে আসে, **৫.** খুব তাড়াতাড়ি, **৬.** গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, **৮.** কলহরত;—গোষ্ঠী, **১০.** জীমূতবাহন কৃত আইনগ্রন্থ, **১২.** সঙ্গীতরাগে মধুকাল।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৫৭
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম

■	ম	ধু	সূ	দ	ন	দ	ত্ত
■	■	নি	চ	■	য়	■	■
পি	ট	■	না	শ	ন	■	■
না	হ	ক	■	ব	সু	ধৈ	ব
ক	ল	র	ব	■	ক	ব	ন্ধ
■	■	ম	ড়	ক	■	ত	ক
■	■	র্দ	■	র	বে	■	■
উ	থা	ন	এ	কা	দ	শী	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৬০ সংখ্যার সমাধান আগামী ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

চিত্রকথা
বিক্রমাদিত্য

প্রায় ১৬০০ বছর আগেকার কথা। ভারতবর্ষের বিরাট অংশ নিয়ে ছিল এক রাজ্য, তার অধিপতি ছিলেন সমুদ্রগুপ্ত। পাটলিপুত্র ছিল রাজধানী। রাজার দুই ছেলে— রামগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত।

ক্রমশঃ

স্বচ্ছ ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪-র স্বাধীনতা দিবসে যে স্বচ্ছ ভারত গড়ার ডাক দিয়েছিলেন, তা অনেকটাই সফল বলে সরকারের স্ট্যাটাস রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। সারাদেশে ৪ লক্ষ ১৭ হাজার স্কুলে শৌচালয় নির্মাণের লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়েছিল। গত এক বছরে তার ৯৮.২ শতাংশ কার্যকর হয়েছে। ২০১২-১৩ রিপোর্টে বলা হয়েছিল ১ লক্ষ ১ হাজার স্কুলে মেয়েদের এবং ১ লক্ষ ৫২ হাজার স্কুলে ছেলেদের জন্য কোনো শৌচালয় নেই। সে বিষয়েও উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে স্কুলে শৌচালয় নির্মাণ কাজে যোগ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। সরকারি সাহায্য ছাড়াই শুধু জনতার অর্থেই ১ লক্ষ ৪১ হাজার শৌচালয় নির্মাণ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছিল। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৬৪ হাজার শৌচালয় নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।

নিউইয়র্কে আলোকসজ্জায় মা কালী

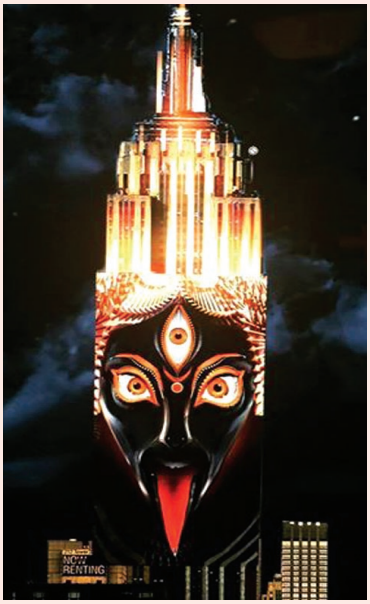

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি নিউইয়র্কের অ্যাম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ে আলোকসজ্জায় ফুটে উঠল মা-কালীর মূর্তি। ১০২ তলা এই বিল্ডিংয়ের গায়ে ওই ছবি নানা ভাবে ফুটে ওঠে। মা কালীর স্নিগ্ধ ত্রিনয়ন দেখে মুগ্ধ নিউইয়র্কবাসী। পাশাপাশি আমেরিকার বুকে মা কালীর এই আলোকসজ্জিত ছবি দেখে বিস্মিত প্রবাসী ভারতীয়রাও। কিন্তু হঠাৎ এরকম হওয়ার কারণ কী? এ প্রসঙ্গে মার্কিন শিল্পী অ্যান্ড্রু জোনস্ জানান, তিনি কোনো ধর্মকে এই আলোকসজ্জায় তুলে ধরেননি। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দেবীকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাঁর দাবি, প্রকৃতি আজ বিপন্ন, দুষণ জর্জরিত গোটা পরিবেশ, তার হাত থেকে প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য শক্তির আরাধনা করা প্রয়োজন। অন্ধকার থেকে আলোর দিশা পেতে দেবী কালীকে আলোকসজ্জার মাধ্যমে সবার সামনে তুলে ধরে যথেষ্ট প্রশংসিতও হন জোনস্। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি অপেরা হাউস এবং বারাণসীর ঘাটকে স্বকীয় ভঙ্গিতে সমানভাবে আলোর জাদুতে সাজিয়ে তুলেছিলেন তিনি। যা দেখে অভিভূত হয়েছিল গোটাবিশ্ব।

নিউ ইয়র্কের এই বিল্ডিং ১৯৩১ সালে নির্মাণের পর দীর্ঘ ৮০ বছর বিশ্বের সর্বোচ্চ উঁচু ভবনের মর্যাদা পেয়েছিল। যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম জনপ্রিয় স্থাপনা ও মাইলফলক হিসাবে আখ্যায়িত হয়। পরবর্তীকালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নির্মিত হলে সেই মর্যাদা খর্ব হয়। আর সেই অ্যাম্পায়ার বিল্ডিংয়েই আলোকসজ্জায় ফুটে উঠল মা কালীর প্রতিচ্ছবি।

ভিখারির সংখ্যায় প্রথম স্থানে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশে ভিখারির সংখ্যায় প্রথম স্থানে উঠে এল পশ্চিমবঙ্গ। কেন্দ্রীয় সামাজিক ও ন্যায় প্রতিমন্ত্রীর দেওয়া তথ্যে প্রকাশ পেয়েছে এখন দেশে ৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৭০ জন ভিখারি আছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই ৮১ হাজার ২৪৮ জন। দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে উত্তরপ্রদেশ (৬৫ হাজার ৮৩৫), এবং তৃতীয় স্থানে আছে অন্ধ্রপ্রদেশ (৩০ হাজার ২১৮)। গত ১৩ আগস্ট কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় প্রতিমন্ত্রী বিজয় সাম্পলা লিখিতভাবে রাজ্যসভায় এই তথ্য জানিয়েছেন। উল্লেখ, ২২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভিক্ষাবৃত্তি বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে।

পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যে দেশে ৭৬১ জন নাগরিক পিছু ১ জন পুলিশ, সেই দেশে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত পাপ্পু যাদবের জন্য ১১ জন পুলিশকে নিযুক্ত করা হয়েছে। পাপ্পু যাদব বিহার থেকে নির্বাচিত একজন সাংসদ। তার বিরুদ্ধে অনেকগুলি ফৌজদারি মামলা চলছে। তিনি ওয়াই ক্যাটাগরি নিরপাত্তা পেয়ে থাকেন। সারা দেশে জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্ত পেয়ে থাকেন ৩১ জন ভিআইপি। ৭৭ জন জেড ক্যাটাগরির, ১৩৬ জন ওয়াই ক্যাটাগরির ও ৩১ জন এক্স ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতে সিভিল ও সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা ১৭ লক্ষ ২২ হাজার ৭৮৬ জন।

সংস্কৃতে শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১২ জুলাই সিমলাতে হিমাচলের ২৭ তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন আচার্য দেব ব্রত। ইংরাজি বা হিন্দিতে নয় সংস্কৃত ভাষায় শপথ গ্রহণ করেন তিনি। হিমাচলের তিনিই প্রথম রাজ্যপাল যিনি সংস্কৃতে শপথ গ্রহণ করলেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
24 August - 2015 - Rs. 10.00

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W
MRP
₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!